মোহনা

পত্রিকা

মোহনপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়

মোহনপুর ❊ পশ্চিম মেদিনীপুর

মোহনপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ও তাঁর অফিস

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে মহাবিদ্যালয়ে আমরা

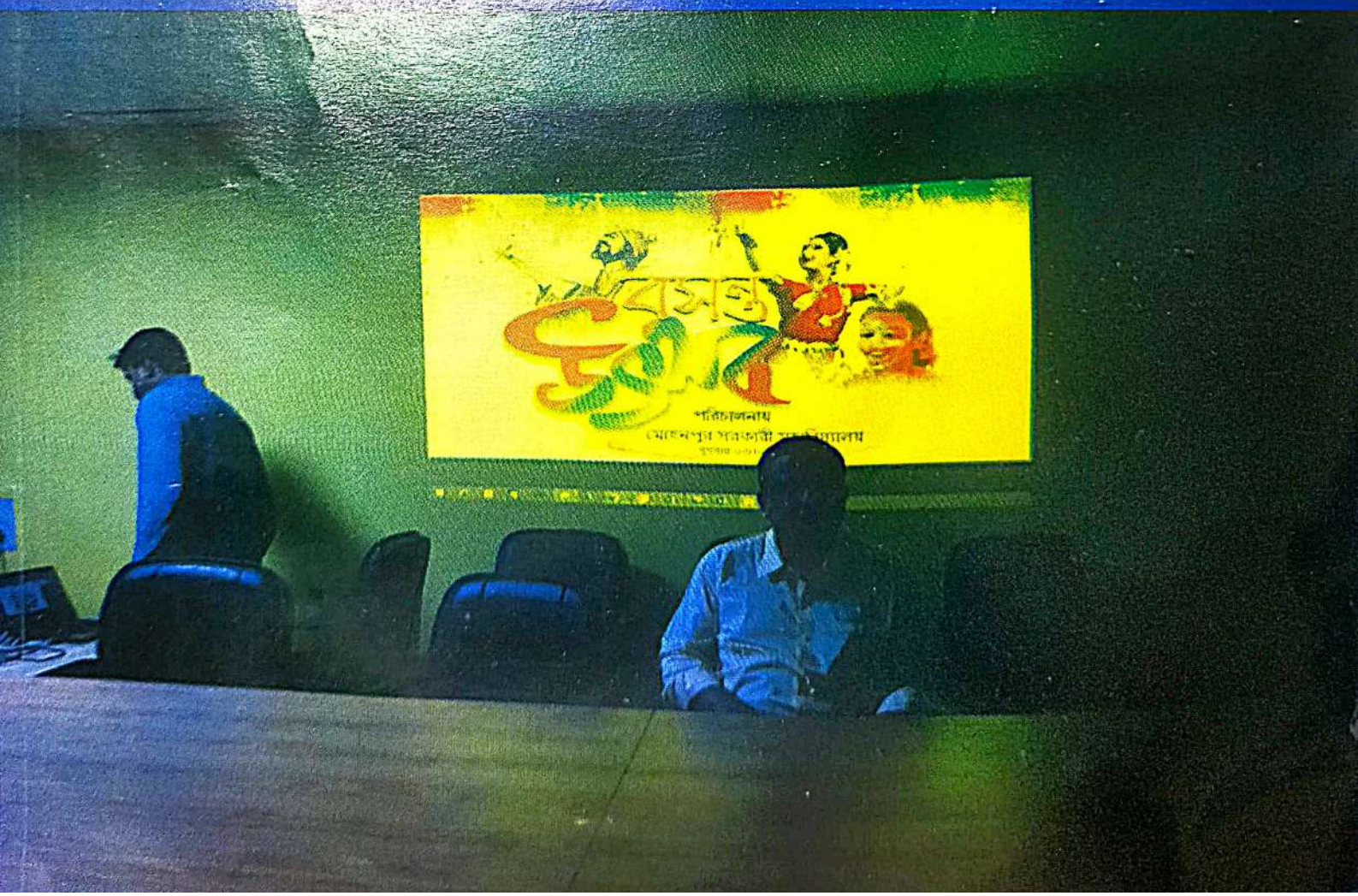

শুভেচ্ছা পত্র

OFFICE OF THE PRINCIPAL

MOHANPUR GOVT. G.D. COLLEGE

SRIRAMPUR :: SIALSAI :: PASCHIM MEDINIPUR :: 721436

ইতালীয় 'লা ভিতা এ বেল্লা' শব্দ বন্ধের অর্থ 'জীবন অনেক সুন্দর'। সত্যিই জীবন সত্য, শিব ও সুন্দরে আধারিত। সেই সৃষ্টি লগ্নে, আদি মানব আদম ও যখন রাস্তা খোঁজার জন্য পথে নেমেছিলেন তখনও তাঁর পাথেয় ছিল সত্য, শিব ও সুন্দর। আমরা তাঁরই সন্তান। তাই আমরাও সেই পথেরই পথিক। পাথেয় কুড়িয়ে চলেছি চিরন্তন-নিরন্তর। খোঁজার ঝোঁক আমাদের সত্তায় বিজারিত-বিরাজিত।

জীবনানন্দে আমরা সবাই সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাসী। সেই সৃষ্টিশীল মানবকে বিবিধ সংরূপে ধরার নান্দনিক প্রয়াসই ''মোহনা''। এটি শুধুমাত্র একটি পত্রিকা নয়, একগুচ্ছ আবেগের বুনন, গাঁথন। পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হলেও এতে আছে এক বিশাল আনন্দ উচ্ছাসের ফল্গুধারা। যা কিছু আগমনের কিছু সম্ভাবনার, মুখ ও মুকুরে ভাস্বর। তাই "মোহনা" র আনুষ্ঠানিক প্রকাশে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই প্রতিষ্ঠান আজ আমোদিত, আপ্লুত ও আনন্দিত। অতএব "মোহনার" সার্বিক ও চিরন্তন সহজ সাফল্য কামনার মধ্য দিয়ে শুভনন্দন জানাই, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবন্ধু এবং প্রাণাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের। যাঁদের ঐকান্তিক চিন্তনে, প্রাক্ষোভিক ও প্রায়োগিক সৌন্দর্যে 'মোহনা' আজ কথা পেয়েছে, হয়ে উঠেছে বাক-মুখর।

PRINCIPAL
Govt. General Degree College
Mohanpur, Govt. of W.B

শুভেচ্ছা পত্র

"মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে
মাঠে, ঘাটে, বাটে, আরব্ধ আগমনী।"

–আগমনী তো আগামীরই সূচনা করে। জানায় সৃজনের আগমনবার্তা। চারিদিকে যখন উৎসবের আমেজ, তখনই 'মোহনা' পত্রিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের মাত্রা পেয়েছে, পেয়েছে অপরকে জানা ও জানানোর সুরাভিত-কায়া। শরৎ অগোচর প্রতিবেশে, 'মোহনা'য় আবেগের অবারিত প্রাণের অনামা কুসুমগুলি সুধা সংকেতে ভরপুর হয়েছে নিঃসন্দেহে। সেখানে স্বপ্নালু-নেশা নতুনেরই কথা বলেছে। তাই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। অতএব, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং ছেলেমেয়েদের নান্দনিক-সাধুবাদ জানাই। সেইসাথে, 'মোহনা'র পাঠকের সরণি বৃহৎ হোক, তার সৃষ্টিধারা উচ্চকণ্ঠ পাক –এই অভীপ্সা জ্ঞাপন করি।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দে
সম্পাদক শিক্ষক সংসদ
ও
সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়
মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

আমাদের কথা

আমরা মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মানুষজন। এই মহাবিদ্যালয় পথ চলা শুরু করেছিল সেই ২০১৫ সালে। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামের এক প্রাকৃতিক সুরম্য স্থানে মহাবিদ্যালয়টি অবস্থান করছে। আজ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী গুণীজনের সমাহারে সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান। এরই মুখপাত্র স্বরূপ, মনের কথার সঙ্গমস্থল হিসেবে 'মোহনা' আজ কথা বলার এক গুরু দায়িত্বে আত্মপ্রকাশিতা। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীর অস্থির সময়ে দিকভ্রান্ত আমরা। এই অসুস্থ প্রকৃতি-পরিবেশকে সুস্থ-সাংস্কৃতিক-শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক, সুন্দর, সংযত, সংহত করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর। আর সেই আকাঙ্ক্ষাই অগণিত ছাত্রমনের স্তম্ভলিপি রূপে প্রকাশের জন্য তৎপর। তাই আজ ছাত্র-শিক্ষক তাদের সামগ্রিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'শান্তির ললিত বাণী' শোনাতেই 'মোহনা'-কে মাধ্যম করে লিখতে বসেছে, তারই গ্রন্থণারূপ এই 'মোহনা'।

এই পত্রিকায় যারা আজ লেখালেখির কাজে প্রয়াস করেছে, তারা হয়তো পাকাপাকিভাবে কেউই লেখক নয়, কাঁচা হাতের অপরিপক্ক মনের কথায়-গাথায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছে তারা তাদের ভাবনাগুলিকে। তাদের সকলেরই লক্ষ্য, সমাজ-সংস্কৃতির বাহনরূপে বয়ে চলুক এই 'মোহনা'। মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও আন্তরিক সাহায্যে এই পত্রিকাকে বাস্তবরূপ দিতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ ও আন্তরিক বদান্যতায় এই পত্রিকা অবশেষে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই অধ্যক্ষ মহাশয়কে কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করতে চাইনা। 'মোহনা' প্রকাশিত হওয়ার কথা কিছুদিন আগেই। কিন্তু ঘাটতি, খামতি জনিত কারণে বিলম্ব হলেও অবশেষে সে প্রকাশোন্মুখা। যথাযথ দায়িত্ব পালনে বিশেষ যত্ন-খাতিরের অভাবেই আজ একটু দেরি হয়ে গেছে, এজন্য আমরা দুঃখিত।

একাজের যদি কোনো সৌকর্য ও সফলতা থাকে, তার জন্য সকল প্রশংসা তাদের প্রাপ্য, যারা লিখেছে/লিখেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশেষে এই আশাই রাখি, আগামী দিনে 'মোহনা' আরও নতুন নতুন লেখায়-আঁকায় সমৃদ্ধ হয়ে নব কলেবরে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে।

পত্রিকা উপ-বিভাগ
মোহনপুর সরকারী মহাবিদ্যালয় - ২০২৩

PRINCIPAL
Govt. General Degree College
Mohanpur.Govt.of W.B

Magazine Subcommitte

Dr. Kazi Sakerul Haque – Convenor
Dr. Sk. Tarik Ali – Jt. Convenor
Suvojit Aown – Jt. Convener

Members :

Shibashis Chattopadyaya
Debabrata Panja
Ujjal Das

All HOD

Avisake Chakraborty
Prasenjit Choudhuri
Partha Sarkar
Dr. Subrata Chakraborty
Dr. Ramesh Chandra Mandal
Ananta Khanra

ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

পত্রিকা উপ-বিভাগ

মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

১। প্রতিমা সিংহ

২। সুমন বাগ

৩। চন্দ্রকান্ত পাত্র

৪। মমতা রানা

৫। অশোক ভঞ্জ

৬। রাখী জানা

৭। দেবাশিষ দাস

৮। অনিন্দিতা দত্ত

৯। রাহুলকুমার সাহু

১০। অন্বেষা সিমাই

১১। বৈশাখী দাস

১২। সারথি রাজ

১৩। পৌলমী পাণ্ডা

১৪। শাশ্বতী ভট্টাচার্য

১৫। মৌমিতা দাস

১৬। স্বরূপ দে

১৭। সুভাষিণী দাস

১৮। মিলনকুমার প্রধান

১৯। স্নিগ্ধা সাহু

২০। দীপক ভট্ট

২১। অমৃতা ত্রিপাঠী

২২। তুষারকান্তি সিংহ

২৩। প্রিয়াংকা জানা

২৪। নিতীশ বেরা

২৫। উত্তম বারিক

২৬। সীমা বান

শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীগণের তালিকা

মোহনপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়

শ্রীরামপুর ঃ শিয়ালসাই ঃ মোহনপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩৬

অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাগণ

ক্রমিক নং	নাম	উপাধি	বিষয়
১.	প্রফেসার ডঃ নিমাইচাঁদ মাসান্ত	অধ্যক্ষ	শারীরবিদ্যা
২.	ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দে	অধ্যাপক	উদ্ভিদবিদ্যা
৩.	ডঃ দ্বৈপায়ন সিনহা	অধ্যাপক	উদ্ভিদবিদ্যা
৪.	অভিষেক চক্রবর্তী	অধ্যাপক	প্রাণীবিদ্যা
৫.	প্রসেনজিৎ চৌধুরী	অধ্যাপক	শারীরবিদ্যা
৬.	ডঃ দাক্ষায়ণী মহাপাত্র	অধ্যাপক	শারীরবিদ্যা
৭.	ডঃ অয়ন মন্ডল	অধ্যাপক	প্রাণীবিদ্যা
৮.	পার্থপ্রতিম মন্ডল	অধ্যাপক	প্রাণীবিদ্যা
৯.	ডঃ সুব্রত চক্রবর্তী	অধ্যাপক	বাংলা
১০.	ডঃ কাজী সাকেরুল হক	অধ্যাপক	বাংলা
১১.	উজ্জ্বল দাস	অধ্যাপক	ইংরেজী
১২.	সুভজিত আওন	অধ্যাপক	ইতিহাস
১৩.	শিবাশিষ চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক	ইতিহাস
১৪.	পার্থ সরকার	অধ্যাপক	দর্শন
১৫.	পুষ্পেন্দু বিকাশ সাহু	অধ্যাপক	দর্শন
১৬.	নয়ন শীট	অধ্যাপক	দর্শন
১৭.	ডঃ রমেশচন্দ্র মন্ডল	অধ্যাপক	সমাজবিদ্যা
১৮.	স্নেহব্রত মুখার্জী	অধ্যাপক	সমাজবিদ্যা
১৯.	দেবব্রত পাজাঁ	গ্রন্থাগারিক	

শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীগণের তালিকা

মোহনপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়
শ্রীরামপুর ঃ শিয়ালসাই ঃ মোহনপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ - .৭২১৪৩৬

শিক্ষাকর্মীগণ

ক্রমিক নং	নাম	উপাধি		ক্রমিক নং	নাম	উপাধি
১.	পরশুরাম জেনা	প্রধান করণিক		১০.	খোকন জানা	নিরাপত্তা রক্ষী
২.	এম. ডি. হামিদরাজা	সহকরণিক		১১.	নন্দ শ্যামল	নিরাপত্তা রক্ষী
৩.	মৌমিতা খাটুয়া	কোষাধ্যক্ষ		১২.	সুদীপ পাত্র	নিরাপত্তা রক্ষী
৪	গঙ্গাধর পাত্র	পিওন		১৩.	রাজেশ অধিকারী	নিরাপত্তা রক্ষী
৫.	এম. ডি. জবিহুল্লা মোল্লা	পিওন		১৪.	জ্যোৎস্না দাস	কর্মবন্ধু
৬.	সাগরী কুন্ডু জানা	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		১৫.	লক্ষীকান্ত বেরা	কর্মবন্ধু
৭.	সঞ্চিতা হাইত	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর				
৮.	সন্ত মন্ডল	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর				
৯.	গোপাল সেন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর				

ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান

ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ দে
সহকারী অধ্যাপক

মোহনপুরে এসেই যেটা প্রথমে চোখে পড়ে সেটা হল শোলা জাতীয় একরকম গাছ, দেখতে জয়ন্তীয় মতো। জয়ন্তীর বন হয়ে আছে এটা একটু অবাক কান্ডই। এগুলিকে এখানে বলে কুঁড়রা, সাধারণ বাংলা নাম কাঠশোলা, এটা একটা এ অঞ্চলের বিশিষ্ট গাছই। বর্ষা থেকে শরৎ এই গাছগুলো দেখা যায়, একটু নিচু, জলা জায়গায়। হলুদ হলুদ অতসীর মতো ফুলগুলো ফোটে শরৎকালে বিকেলে। আর দেখা যাবে খড়িবন। পানবরোজ তৈরিতে লাগে বলে জলাগুলোর চাষ হয় তবে এগুলি জলাভূমির বন্য ঘাস। যেখানে সেখানে দেখা যায়, শরৎকালে কাশের মতো শিষ হয় তবে সাদা নয় খয়েরি।

প্রচুর লতাগাছে পথপাশের গাছপালা বেড়া আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুঁইচলতা অর্থাৎ গুলঞ্চলতা, বনকলমি, তিতা তড়বা, রাবণলতা আর পাঠ্য। শেষরটিকে এখানে ধ্রণীলতা বা নিমুতা বলে। রাবণলতাকে সিপিএম পাতা বলে, এর পাতা সারা পশ্চিমবঙ্গেই রক্ত বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। শিয়াড়িলতা নামে বিরাট একপ্রকার কাষ্ঠল লতা এখানে পাওয়া যায় যদিও দ্রুত কমে আসছে। বর্ষায় ফুল ফোটে, তবে সচরাচর ফুল দেখা যায় না। কেশিয়াড়ির লোকবিশ্বাস এর ফুল ফোটা ঘূর্ণীঝড় বা প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাষ। আর একটি বড় কাষ্ঠললতা হল রক্তখাই। নাট্যকে এখানে শিলা বা গিলগাছ বলে, এর বীজগুলো বাচ্চারা পাথর বা দেওয়ালে ঘষে গরম করে গায়ে ছ্যাঁকা দেয়।

যে সমস্ত গাছ অবাক করবে সেগুলো হল দুপুরে মণি, রঙকাঠি, দোমুটি। দুপুরেমণি যে কোথাও বন্য অবস্থায় জন্মাতে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। এটা এখানে জলা জায়গাগুলোয় বর্ষায় জন্মায়। বাগানের দুপুরে মণির মতো এগুলির ফুলও শরতে হয়। বাগানের গাছের থেকে এটি দেখতে অনেক ভালো, ফুলের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা লাল বা কমলা এবং কান্ডে দূরে দূরে হয়। সম্ভবত বাগানের রঙ্গনের একমাত্র বন্য বাসভূমি হল মোহনপুর। জলা জায়গাগুলোতে হয়। গায়ে লাল বা অন্য রঙ হলে এর ডালের ছোট একটুকলো গলায় ঝোলায়। বাচ্চাদের রঙ হরলে এর কাঠি ব্যবহার হয় বলে নাম রঙকাঠি। দোমুটি একরকম বন্য দোপাটি, জলজ উদ্ভিদ। দোপাটিকে এখানে হরগৌরী বলে, এটাকেও। এই তিনটি এখানের বিচিত্র ও বিশিষ্ট গাছ দ্রুত বিলীয়মান। এদের বাসভূমি সংরক্ষণ ছাড়া এদের বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধারের দ্বিতীয় কোনও স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে বলে মনে হয় না।

রাইবঁইচ বা রামবৈঁচি নামে একটা কাঁটাগাছ কোথাও দেখা যায়। নাম রাংবৈঁচি হলেও এর সঙ্গে বৈঁচির কোনও সম্পর্ক নেই, ফলও খাওয়া হয় না। রানিকয়েত এখানে কম হলেও পাওয়া যায়। এর কাঁটা খুব জ্বালাকর বলে এই গাছকে দহগাছ বলে।

একরকম বন্য কসমস এখানে পাওয়া যায়, শীতকালে গোলাপি ফুল হয়। এটি নাকমাছি বা নাগমাছি নামে পরিচিত। তারাগাঁদার সঙ্গে এত মিল যে এই দুটোর নাম প্রায়ই এক হয়ে যায়। আগে এটি অনেক জায়গাতেই ছিল, এখন বিলুপ্তপ্রায়। বকফুল এখানে কস্তুরিফুল নামে খ্যাত। এটি তিন রকমের পাওয়া যায়, সাদা ফুলেরটা খুব কম দেখা যায়, সাদাফুল কিন্তু পতাকা গোলাপি এটা সব থেকে সাধারণ,

পুরো গোলাপি ফুলেরও পাওয়া যায়। শাঁকআলু চাষ হয় আবার নিজে থেকেও হয়। চাষ করা শাঁকআলুকে রসআলু এবং বন্যকে কাঠালু বলে, এর জলের অংশ কম বলে একটু শক্ত হয়। বন্য ওলের ফুল এখানে নিয়মিত হয়, শীতকালে এখানে সেখানে ভুট্টার মতো কিন্তু খুব বড় এদের ফল দেখা যায়। এককালে এই স্থান অরণ্য ছিল। তার স্মৃতি হিসেবে একটা শালগাছ, কয়েকটা মহুয়া ও কুসুমগাছ এখানে আছে। মহুয়াকে এখানে মহুলিয়া আর কুসুমকে কুসুমকুল বলে। জঙ্গলের ময়নাকাঁটা এখানে ছোট ছোট ঝোপ, মমতাগাছ বা মমতাকাঁটা নামে পরিচিত, এর কাঁটা দিয়ে নাক, কান ফুটো করা হত।

টোপাকুলকে এখানে বয়েরকুল বা বোরকুল বলে। কাশফুল হল শিয়াকুল। নারকেলকুলকে গয়াকুল বলে। অনেক ফলকেই এখানে কুল বা কুলি বলে, যেমন, জামকুল, আঁকবুল বা দুধকুল, শিলাকুল বা জংলাকুল বা সান্নাকুল, কুসুমকুল, ফরসাকুল, বকুলকুল। নোনতাকুল নামে একটি বন্য ছোট বৃক্ষ এখানে মোটামুটি ভালই পাওয়া যায়। এর ছোট ছোট ফলগুলি বাচ্চারা খায়। এর অন্য নাম নুননুনকাকুল বা নুনকাকুল।

জলজ গাছগুলির মধ্যে ছোটনীলশালুক সহজেই চোখে পড়ে, একে হাড়িকঁই বলে, এটি বন্য এবং এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। নীল ছাড়া সাদাশালুক পাওয়া যায় তবে কম। সাদা শালুকের বীজ ভেজে ঘেঁটুমুড়ি করা হয়, আসলে হত এখন প্রচলিত নয়। লালশালুক সম্ভবত নেই। শালুককে কঁই বলে। সাদাপদ্মই এখানে হয়, লালপদ্ম নেই। অর্ধজলজ গাছগুলোর মধ্যে বাঘুয়া উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ডোবা পাতাগুলি খুব চেরা চেরা হয়, উপরেরগুলি গোটা থাকে। জল কমে গেলে ডাঙাতেও এদের দেখা যায়। রক্ত বন্ধ করতে এর পাতা গোটা দক্ষিণ মেদিনীপুর জুড়ে ব্যবহৃত হয়।

অন্য জলজ গাছগুলি হল জলকদুল, পানশিউলি বা শিমলি পাতা, শিমুলপাতা বা শিবলিপাতা নামে পরিচিত। এর পাতা বাচ্চাদের পেটব্যথায় পেটে বসিয়ে রাখে। টোকাপানা হল হদি বা বড়হদি। কচুরিপানাকেও বলে বড়হদি, তখন আবার টোকাপানাকে ছোটহদি বলে। ছোটপানাকে ছোটহদি বলে। জলজ বা অর্ধজলজ ঘাসগুলির মধ্যে আছে চুড়চুড়ি, চিচড়া, চ্যাপ্টাদল, খেসুর, হেঁসাতি, বড়হেঁসাতি। গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে এই খেসুরের কন্দ খাওয়া যায়। চাষ করা গাছগুলোর মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। পান, ধান, তিল, সরষে, চেনেবাদাম এখানের অতি সাধারণ কৃষিজ ফসল। অন্যত্র যেগুলো দেখতে পাওয়া যায় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোল আর সাপশিরি। পলো বা পালু দক্ষিণ মেদিনীপুরের একটি অতি সাধারণ কৃষিজ উদ্ভিদ। এর মৃদ্গত কন্দ গুঁড়ো করে সরবৎ করে খাওয়া হয়, একটু মেটে গন্ধ থাকে, কিন্তু খুব জনপ্রিয়। অ্যারারুটের চাষও হয় এবং এটি পলোর সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। সাপশিরি বা চন্দনী রাঁধুনির মতো গাছ, শীতকালে দক্ষিণ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে এর চাষ হয়। মশলা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আর একটি মশলা হল সবরকোচ বা সবরকচু, এর মাটির নিচের আদার মতো অংশ পানের সঙ্গে খাওয়া হয়।

'সহজপাঠ' খ্যাত পিড়িংশাক এখানে শীতে ভালই চাষ হয়। এখানের সাধারণ সজনে একটু অন্যরকম, এর ফুল সাদা নয় লালচে। ডাঁটাও বিটের মতো লাল। এখানে একে বলে বারোমাসিক সুন্না, এটাই আয়ুর্বেদের রর্কশিগ্রু বা রক্তশোভাঞ্জন। সাদাফুলের সজনেকে সাঁইসুন্না বলে। লালের থেকে সাদাসজনে খেতে ভালো। বারোমেসে সজনে বা নাজনা এখানে নটেসজনে নামে পরিচিত। অন্যান্য প্রচলিত শাকগুলি হল খোসলা বা খতগড়িয়াশাক, লালখোলসা, শুষুন্ডিশাক, তেলচচ্চড়ি। বন্য

শাকগুলির মধ্যে চিকনিশাক বা চিকনাশাক খুব জনপ্রিয়। এছাড়া আছে শ্বেতপুণ্যি, শিবলাটা, জগন্নাথ মারসি বা জগন্নাথ লওটিয়া, টকশুষনি, মদরঙ্গা। ঘোড়ামদরঙ্গা খাওয়া হয় না। বেগুনিফুলের থেকে এখানে সাদাফুলের কলমিউ পুকুরে বেশি দেখা যায়।

খুব ছোট এরকম কাঁটাবেগুনকে মুড়িয়াতুড়ি বা মুড়িয়াথুড়ি বেগুন বলে, হাটে বিক্রি হয়। এগুলি কাঁচার থেকে পাকাই বেশি পছন্দের। বেশ কয়েকরকম লেবু এখানে লাগানো হয়, টাভা, মৌটাভা, নারিঙ্গলেবু প্রভৃতি। কিন্তু স্কোয়াসলেবু লেবু নয়, এটি একপ্রকার ঝুমকোলতার ফল, এটি সরবৎ করে খায়। ছাতু এখানে খুব প্রচলিত খাদ্য নয়। দুটি ছাতু মোটামুটি পাওয়া যায়, একটি খড়ছাতু অন্যটি ফড়িঁছাতু বা টিকরাছাতু।

ভেষজ উদ্ভিদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুষাকানি, অপামারঙ্গ, আইপানপাতা, গাঁদিয়াড়ি বা গাঁধালি, চালধুয়া, কালোকোসিদা, কুইলিরেখা বা কুলখা, কুদালিয়াঘাস, পোকাসুঁকা বা মইষা পোকাসুঁকা, বাসনপাতা, বেগুনিয়া, মেদা, হিড়মিচা। অনেকগুলি গাছকে পোকাসুঁকা বলে, যেমন ঘোড়া পোকাসুঁকা, মইষা পোকাসুঁকা, গাইয়া পোকাসুঁকা, বেড়ার গাছের মধ্যে বহুল প্রচলিত ঘোড়া পোকাসুঁকা। এখানে নিশিপদ্মের মতো একরকম পরাশ্রয়ী ক্যাকটাস আছে, বড় গাছের উপরে হয়। একে গাঁদ বলে। 'কাশমুলী কলে'র উল্টোদিকে একটা গাছের উপর এর একটা বড় ঝোপ আছে। কেশুতকে কালোকোসিদা বলে, এর অন্য নাম কলাকোসতা।

দোপটিকে হরগৌরী বলে, এখানে এর পাতার রস মেহেন্দির মতো ত্বক-অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়। পিঁজুটি পাতাও এভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এদের রঙ খুব গাঢ় হয় না। মাদুরকাঠির চাষ খুব কম। রানিকাঠি বলে আর এরকম জাতের মাদুরকাঠির চাষও হয়।

ধর্মীয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুয়াল বা বুয়ালি। এটি বৃক্ষবিশেষ, নলপূজায় লাগে। নলপূজার অন্য একটি উপকরণ অনসরষে, কেঁউ প্রভৃতি। চ্যাপ্টাদল একটি জলজ ঘাস। হেঁসাতি একটি জলজ মুষাজাতীয় ঘাস। এগুলি কোণষষ্ঠীপূজার অন্যতম উপকরণ। পিঁজুটি তিনরকম হয়, সাদা, নীল ও হলুদ। এগুলি অগ্রহায়ণ মাসে পূজায় লাগে। গোলকান্ডের মনসা এখানে কম, যেটি পূজা হয় সেটিও কান্ডে পাঁচটি শির বরাবর কাঁটা থাকে। পঞ্চমুখী মনসা নামে আর একটি মনসারও পূজা হয়। ঝুঁটিফুল দিয়ে অন্য জায়গার মতো এখানেও দূর্গাষষ্ঠীর দিনে দেওয়ালে গেরুমাটির ফোঁটা দেওয়া হয়। ন-নগলিয়া ফুল দিয়ে গম পূর্ণিমায় গোরুকে পূজা করা হয়।

গাছের নামে বেশ বৈচিত্র্য আছে, বেশিরভাগ নামই ওড়িয়া প্রভাবিত। বিলাতি তেঁতুলকে কিবিমিচি বলে। একটু শক্ত হলে তাকে কাঠ কিচিমিচি বলে। বাবলা পাওয়া যায়, কিন্তু রেবুর নামেই সবাই চেনে। গাবকে এখানে কেন্দু বলে, এর ফল খায়। এখানে আনারসকেও কেয়া বলে, সেজন্য কেয়াকে বড়কেয়া বলে। কালমেঘকে বাতমৌরি বলে। গাঁদা এখানে মডা নামে পরিচিত, টুরিগাঁদার না মসাতপত্রিয়া আর রক্তগাঁদা রক্তমডা। এরকম বেশি পাপড়ির টুরিগাঁদা চাউলিয়ামডা নামে খ্যাত। তারাগাঁদা এখানে কটকতারা বা নাগমাছি, আর পাথরকুচি হেমসাগর। সীতাহরা এখানে রাসমণি, আবার মধুমালতী এখানে সীতাহার। কলকে এখানে করবরি, যদিও করবরি এসেছে করবী থেকে। শালগমকে এখানে সজারু বলে। রামতুলসী এখানে বিলতুলসী আর বাবুইতুলসী বৃন্দাবনী তুলনী নামে পরিচিত। দাদমারী এখানে দাদু। কমাফল হল হরীতকী, করবঙ্গা হল কামরাঙ্গা। চালকুমড়াকে পানিকুমড়া বলে,

আশ্চর্যের ব্যাপার উত্তরবঙ্গেও তাই বলে। বাঁকুড়ার মতো এখানেও কুমড়া বৈতাল। কাঁকরোলকে বলে ক্যাঁকড়। ঝিঙাকে বলে জনি বা জানহি। সেই মতো পটোলঝিঙা হল পুটলিয়াজনি। মাখনশিম এখানো মৌটো। টমেটো হয়ে গেছে টমাটুম আর ইউক্যালিপটাস হল পটাস।

খুব সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক নাম ও তথ্যে কন্টকিত না করে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে মোহনপুরের বিচিত্র উদ্ভিদকুলের পরিচিতির একটা প্রচেষ্টা এখানে করা হল। অনেককিছু বলা গেল না। অনেক কিছু জানার বাকি রয়ে গেল।

বিপুলা ও বোটনির আমি কতটুকু জানি!

এক বাটি জল এই সিলেবাসখানি।
তার এক চামচ আমি দেখিয়াছি চাখি
অনন্ত সাগর আজও রহিয়াছে বাকি।।

লক্ষ-কোটি গাছ লয়ে এ বিশ্বের মেলা
দু-একটির পাপড়ি ছিঁড়ি করিয়াছি খেলা।।

Structural Organization of Beehive

Avisake Chakraborty, Assistant Professor, Mohanpur Government of College
Department of Bio-Sciences

Honeybees have developed one of most highly organised societies. They lived in colonies. The colonies of the honey bees are perennial and a good colony of honey bee may consist of 50,000 to 80,000 individuals. It comprises of one female or the queen, a few hundreds of male bees or drones and the rest are sterile females or workers.

The queen lays the eggs which develops into new workers, drones and queens. She also emits a complex series of chemical secre-tions, the pheromones that regulate much of the behavious of the workers. Both wueen and worker are genetically diploid. Queens, however, are fed a special rich larval food; a white, foamy, yogurt-like royal jelly.

It is necessary for normal queen size and sexual develop-ment. Workers too, can develop into sexually reproducing females, but their reproductive organs are kept undeveloped through the effect of the queen's pheromones. Drones are genetically haploid and are produced by the laying of unfertilized eggs by parthenogene-sis. Drones are generally produced at the same time as the new queen.

A. Worke : The worker honeybee is the smallest mother of the colony. It is black or brown in colour and its month parts are of the rasping and lapping type, to facilitate the collection of nectar and pollen. The legs are covered with hair and are adapted for gathering pollen.

The metathoracic legs bear a pollen brush and a spine-like pollen spur to remove pollen from pollen baskets. The metathoracic legs has a depression called the pollen basket. The last four visible is essential of the abdomen have modified cells on the ventral surface that secretes wax, which is essential for making the hive.

A worker honeybee lives for about 6 weeks as an adult and her activities are to some extent synchronized with her physio-logy. She spends the first three days in clean-ing the cells and then begins feeding the older larvae a mixture of pollen and honey.

This she picks up from the storage cells of the hive. The workers then start secreting the so called royal jelly, and from about the 6th to the 14th day of her life she feeds this secretion to the younger larvae and any queen larvae in the hive.

For a brief period, the royal jelly is fed to all larvae, but those that will become the queen are fed with royal jelly throughout their larvael period. From the 10th day onwards, the worker's wax-secreting glands on the abdo-men become active and, at the same time, the pharyngeal glands begin to regress. The workers then gradually change their behaviours from feeding larvae to cell construction.

About the 18th day, the worker may leave the colony occassionally for a few brief orientation flights. At this stage, she may be found guarding the hive entrance and inspecting incoming bees. From the 21st day onwards the workers change into a forager, bringing back nectar, pollen and water, and continue this function for the rest part of its life.

The duties are related to the age of the worker:

Age of worker Bee	**Duties performed**

(a) Till 3rd day of emergenc	Maintain wax cells in sanitary state, cleaning their walls and floors after the the emergenc of young bees.
(b) From 4th-6th day of emergence	Feed older larvae with mixture honey and pollen and making flights around the hive for getting layout of the hive, (play flights or orientation flights)?
(c) from7th-11th day of emergence	Hypopharyncal glands (food glands) get developed and start secreting royal jelly and feed younger larvae.
(d) From 12th to 18th day	The bees develop wax glands and work on building of comb, construction of cells etc. Receive the nectar, pollen, water, propolis etc., from field gatherers and deposite in the comb cells and help in keeping the brood warm.
(e) From 18th to 20th day	Perform guard duty
(f) From 20th day onwards	The worker bees take the duty of field i.e. exploring or foraging for nectar and pollen, collecting water and propolis.

B. Drone : Drones are intermediate in size but considerably stouter and broader. They possess large eyes, small pointed mandibles and lack wax-producing glands, pollen-collecting apparatus and a sting. The drones do not do any work and, if not fed by the workers, they die. They exist only to made withthe queen.

C. Queen : The queen being the only fertile female of the hive, have immensely developed ovaries. The queen is elongated with a long tapering abdomen with comparatively shorter wings and legs. She has pointed mandibles and shorter mount parts and sting with no barbs.

She alone lays eggs and is the mother of almost all the members of the hive. She lives for several successive years lying about 1-200 eggs a day and laying about 15 lakh eggs during her life time. When a hive of honeybees prepares to swarm or when an old queen becomes weak, the regulating pheromones of the queen also become weak. This serves as a signal for workers to begin raising a new queen.

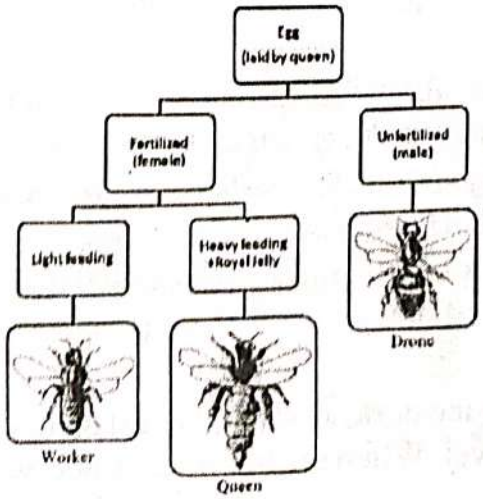

Swarming : Swarming takes place during the spring or early summer. This relieves over-crowding and also provides a means of founding new colonies. Prior to a swarm, a large number of queen and drone cells are constructed. Then on a clear day the old queen leaves the hive with a group of old workers and drones.

Left behind in the hive are they young workers and several new queens who are still in their cells but approaching the time of emergence. The first queen that hatches out becomes the mistress of the parent colony. This new queen kills any other newly hatched rivals.

After about a week of her emergence, the queen flies off to mate. By this time. drones also have left the hive and have aggregate in traditional sites in large flying clouds. The drones from many neighbouring hives may also combine in such a cloud called drone cloud. When the new queen approaches such a drone cloud, the drones rush to the queen and several of them may mate with a queen in succession.

Mating occurs in mid-air. The sperms are stored in a spermatheca or sperm-reservoir of the queen which certilizes her ..... with its genital parts remaining in the ..... /workers. The queen, after mating, returns .....old and leads a prime after mating, returns swarm.

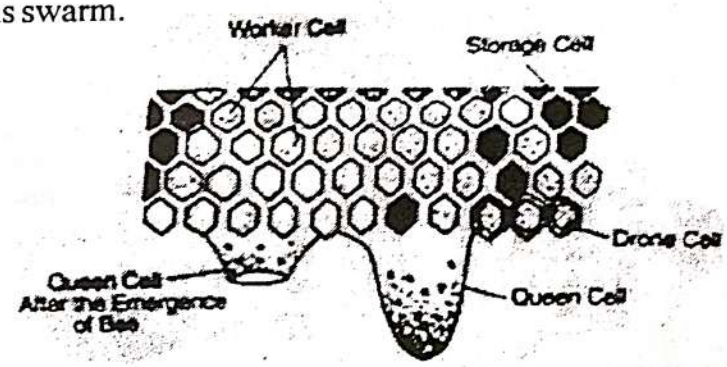

Bee-hive :

The bee-hive consists of two layers of hexagonal chambers or cells made by the bees was secreted from the abdomen of the worker bees. Before the wax is used it is masticated and mixed with secretions of cephalic glands to convert it into a plastic substance.

The bee-hive consists of five types of cells :

1. Queen cells : These are a very few in number in a hive. They are larger than the other cells and vase-shaped, and are situated at the margin of the comb. These cells are used for queen rearing.
2. Drone cells : There are about 200 drone cells in each hive and are smaller than the queen cells. The drones are reared in these cells.
3. Worker cells. Majority number of cells is worker cells and each cell is about 5 mm across. The workers are reared in these cells.
4. Brood cells : The larvae of the honey bee are reared in these cells.
5. Storage cells: These cells are meant for the storage of honey and pollen.

Section of Honey-Comb :

A bee-hive has elaborate homeostatic mechanisms that maintain a constant temperature, water balance and nutrient level. When the bee-hive is hot, worker bees fan air throughout it

and cool it off. When the hive is short of water, then the nurse workers turn to the nearest workers and signal a need for water. The latter then gives what water it has and then turns to its neighbours. Thus, the meassage of the shortage of water moves from bee to bee untill it reaches a worker who leaves the hive and returns with more water. When a predator or parasite enters the hive, worker bees rush forward and defend the colony and in the process they may die. Thus, a bee-hive works as a marvelous society.

The honey bee would make its nest in a hollow tree. Dissection of the hive demonstrate the relative position of the honey, pollen .....produced at the very drone cells are on the edge of the brood-..... The same pattern is seen in the ..... With honey stored at the top of ..... centre. Between the honey (1) and the brood (2) is a narrow .....

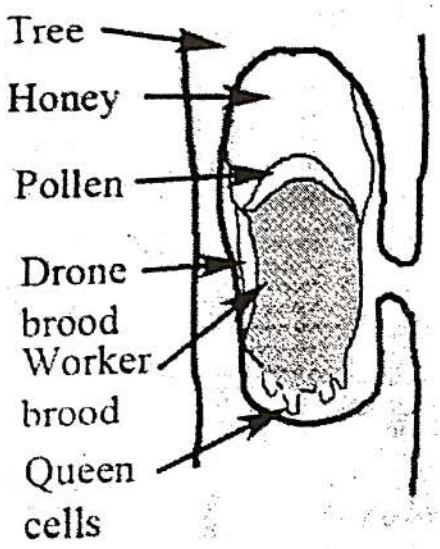

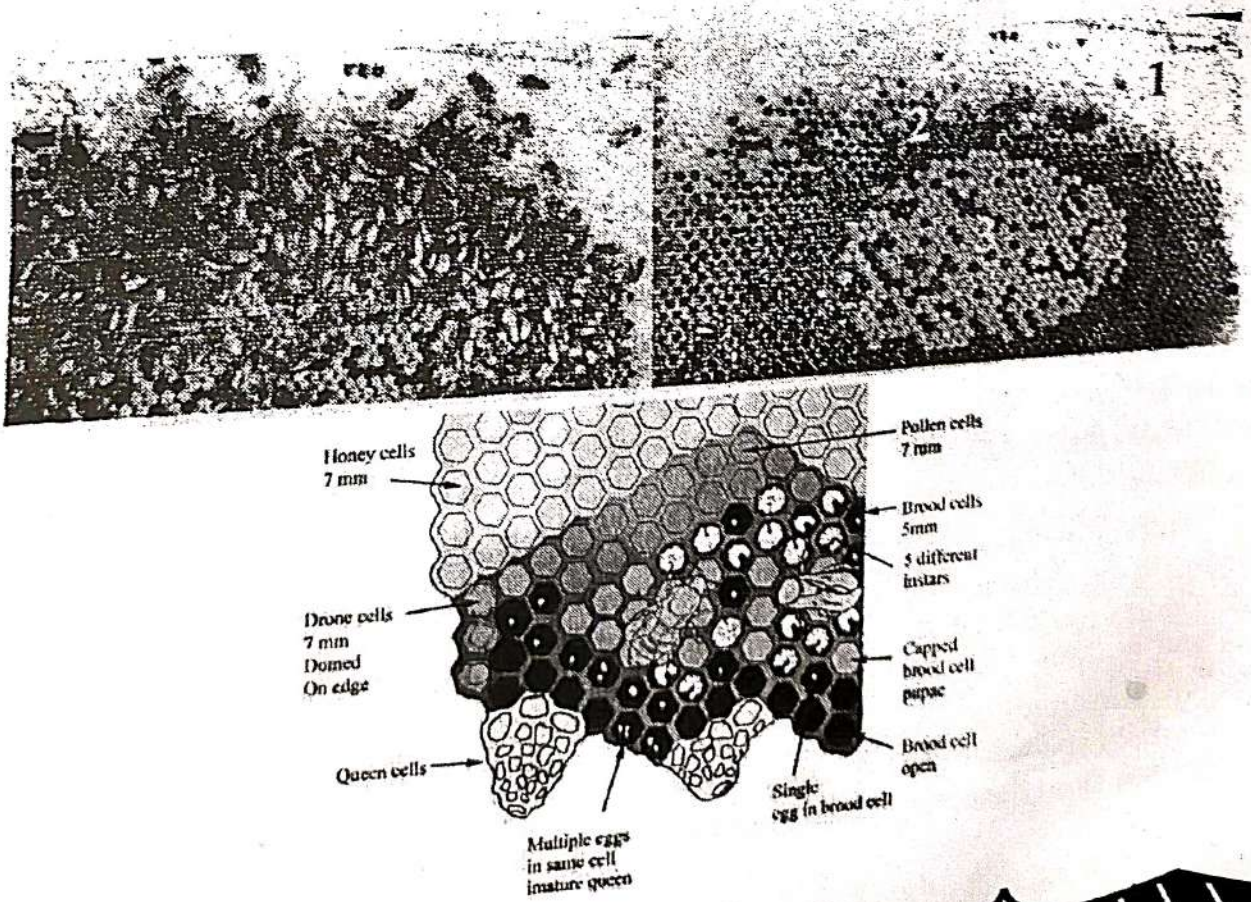

Number of bees in a hive

In an active hive there will be around :

1 queen

300-500 drones

25,000 older forages

25,000 younger hive bees

20,000 capped broood

9,000 uncapped larvae

9,000 uncapped larvae

6,000 eggs

Thus around 80,000 bees in each hive.

Approximately, 20,000 different species of bees exist wor4ldwide, occupying every habitat that contains flowering plants. Bees live in a symbiotic relationship with flowers, having evolved a long tongue or proboscis for lapping up nectar. Many bees are social insects, living and working together in highly organized colonies or communities. They live in various kinds of natural habitations called hives or nests.

Hollow Trees

Feral or wild Apis mellifera honeybees are eusocial, meaning they live in large, well-organized colonies employing a strict divison of labor in regards to building and maintaining hives and caring for offspring. Commonly building their hives in hollow trees, they are cavity dwellers, a characteristic that makes the species easily domesticated. In the wild, they will seek out an enclosed space with a capacity of 15 to 100 litres in which to build their hive.Once the bees have selected a suitable tree with a hollow trunk high enough off the ground to deter honey hunters and with a south-facing, downward-pointing entrance, they set to work preparing their new hive. The bees strip off outer layers of bark to smooth the wall, then seal and coat them with propolis or "bee glue" made from tree and plant resins in preparation for building was honey combs.

Underground Hives

Bumblebees, of the genus Bombus, prefer to locate their natural behives underground, usually in abandoned animal burrows and tunnels. After emerging from hibernation in the spring the queen bumblebee will select a hive site, as bumblebees only use a nest for the first brood of workder bees. The workers will sometimes building a wax canopy over the hive entrance to delete their predators, mainly skunks.

Aerial Hives

Aerial, or open-air, hives are constructed by southeastern Asian boney/ bees belonging to the general Micrapis and Megapis. These permanent natural hives are similar to the temporary swarm nests of the Apis mellifera honey bees. The Asian bees cconstruct honey and brooder combs attached to exposed tree nlimbs or cliff faces. They coat the immediate surrounding area with waxy proplis to prepare it for comb construction. The paralle, evenly spaced, rows of combs are covered by the bodies of the bee colony member for protection from the elements and predators. During rainstorms the bees on the outer layer

extend their wings over the swarm to keep the inner combs dry.

Hive Materials

There are three major materials that spring to mind thinking of the products of bees : honey, wax, and propolis. You may not know the third one immediately, but it's a very important part of the hive in terms of structure and sanitation. First, though let's look at the better-known materials our bees make.

Wax

Wax is everywhere in a hive. In some ways, it is the hive. Your store-bought equipment has lots of wooden components, but in the wild a colony will likely set up shop in the holow of a tree, meaning all that structure is bee-made.

The vast majority of the hive is comb- a series of interlocking hexagonal cells made of was. It is in these hexagons that brood is raised and honey and pollen are stored. Bees make it all!

Worker bees have glands on their bodies that produce little flecks of wax. These glads work best when the bees are 16 to 18 days old, then degrade as they age. It may sound like a short window of time, but when you only live for a month, three days is no small commitment!

To make wax, bee seats honey and converts the sugar inside her body. It comes out clear through pores on her sides and then either she or a nearby been will chew it, mixing it with saliva to make it workable. She adds this little mouthful of wax to the comb, then starts the process all over again. It takes about six pounds of honey to produce a single pound of was.

Honey

Honey bee colonies need to overwinter an thus need to stockpile a huge amount of food for when it's too cold to go outside. Not only is it too cold to go outside, they also need to move their bodies enough to keep the inside temperature around 90F. That takes alot of energy and all of it comes from honey.

A colony needs about 25 to 30 lbs of honey to make it through an average winter, but this number goes up considerably in colder locations. If the bees have space, though, they'll keep stockpilling, and a good colony can make 100 lbs in a season. Bees are tiny and a pound is a lot of honey. It takes about 55,000 miles of flight to produce a single pound of honey. There really a strength in numbers.

To produce honey, a worker bee sucks nectar from a flower through her proboscis and stores it in a nectar sac inside her throat. She carries it back to the hive, mixing it with enzymes in her saliva along the way. Back home, she opens her mouth and a housekeeping worker bee sucks the nectar into her own proboscis and mixes it with her own enzymes.

She also starts a process called ripening, which is basically the removal of water from the honey. She moves the honey back and forth between her nectar sac and her proboscis for 15-20 minutes. Every time it reaches her proboscis it's exposed to the air and loses a little water. She then passes the honey onto another bee, who repeats the process. With every bee it gets a little richer. If the nectar flow outside is low, bees concentrate more on what they have and will pass the honey around quite a few times. If the nectar flow is high, they'll only pass it a couple of times before storing it in a cell.

Once in the cell, the honey stays there for a few days to allow more water to evaporate. If nectar flow is low, the bees will only fill the cell up 1/4 to 1/3 of the way, which makes for better evaporation. If nectar flow is high or space is right, they'll fill it 1/2 to 3/4 of the way. During this time, it drops from around 50% water to about 18%.

The bees then move it to another cell, which they fill 3/4 of the way. After 1/4 days, the honey should be ripe, with its water content around 18%. The bees cap it with a layer of wax to prevent further evaporation.

Propolis

Propolis is less well-known than honey and wax, but it's still very important to the colony. Also called 'bee glue', it's a kind of filler the bees use to patch small holes and insulate the hive. It is super sticky and never hardens completely because it is 50% tree resin.

When bees are out foraging, instead of visiting flowers they'll sometimes visit trees that are weeping resin or sap. They collect it on their back legs, just like pollen, and carry it back to the hive to be mixed with wax, pollen, oils, and over a hundred other compounds. The result is propolis and it's used in all kinds of ways around the hive.

It it's not made out of wax in the hive, it's probably made out of propolis. If a space is smaller than centimeter, bees consider it too small for comb and fill it in with propolis. It creates an almost solid barrier that keeps the cold out. They'll also use it to change the shape of the hive, for example to close off a wide entrance or to smooth over rough surfaces. Bees may also store up to a pound of propolis for emergency patch jobs.

There's amother use for propolis and it's pretty amazing.

A mouse is small enough to climb inside abeehive. He might be looking for food or warmth but instead he meets with thousands of territorial bees. It only takes five stings to kill him. At this point, the bees have protected their hive but now they have a decomposing eorpse that is way too heavy to move. There's only one thing for it: the bees encase the mouse in propolis, essentially mummifying it and keeping it from contaminating their home.

পথভ্রষ্ট

ড. সেখ তারিক আলি
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কি হবে এই গতির জীবন, স্বপ্ন-সাফল্যের অতিকথা,
অহং-ফানুসের আত্মকথা দীনতায় ভোগে
বোঝেনি উর্বীরূহ-নীরবের ব্যথা-আকুলতা।
চলছে গতির খেলা, অস্পষ্ট গোঙানি-যন্ত্রণা
হাঁপিয়ে উঠছি এই সুড়ঙ্গজালে, শব্দ প্রাণহারা
নিকটদর্শনও হিজিবিজি পোকাবৃত, হেলেছে অ্যান্টেনা,
আশাতরী টলমলে আজ, মেঘে ঢাকা ধ্রুবতারা।।

বড়ো একা

ড. কাজী সাকেরুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বড়ো একা লাগে।
বিশাল এই পৃথিবীতে আমার-বড়ো-পৃথিবীর
বহুর মধ্যে আমি একা।
একি স্বভাব দোষে ?
হবেই তো তা।

আমিই তো নিজেরটাকে নিজের মতো করে
ভাবিনি কোনোদিন কোনোভাবেই।
তবুও তুমি তোমার বদান্যে আমাকে
ভেবেছো নিজের মতো করেই।
তবু তুমি আছ আমার মুখ চেয়ে, সে কি
বুঝিনা !
আসলে নিজত্ব খাটাতে খাটাতে তোমাকে,
তোমাদেরকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

সত্তার একাধিপত্যে আমি অজেয়-জ্ঞানে
ছিলাম গর্বিত, উদ্ধত।
আজ কেমন যেন হয়ে গেল !
নিজের সান্ত্বনা হারিয়ে ফেলে তোমার
সমবেদনার আশায় মুর্খামিতে প্রতীক্ষায়।
হায়, তা আর জুটল কই ?

হতাশ হয়ে নিরাশায় ডুবে খেই হারিয়েছি।
বড়ো একা, বড়োই একা আছি।

আমার তিল তিল করে গড়ে তোলা ভবিষ্যৎ
স্বপ্নগুলোও বিদ্রোহ করে।
আমাকে বুঝিয়ে দেয়, 'তোর গোয়াতুমিতে
তুই একাই থাকবি'।

সত্য, বড়ো অসহনীয় একা আমি।

'পল্লীসমাজ' এর সামাজিক প্রেক্ষাপট

রাজেশ মান্না

উপনিবেশিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আর্তনাদকে অন্তরে ধারণ করে পীড়িত বঞ্চিতদের ব্যথার গল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আগমন করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮)। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের নানা টানাপোড়েনের পাশাপাশি সামাজিক ও জাতীয় সংকটকে তুলে এনেছেন তার লেখায়। এরই প্রেক্ষিতে উপনিবেশিক শৃঙ্খলিত বাংলার পল্লী সমাজের অনাচার ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় রচনা করেছেন "পল্লী সমাজ" (১৯১৬) উপন্যাসটি। প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯১৫ সালে। উপন্যাসে সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রমেশদের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। ফলে ঐ সময়ে উপন্যাসটি সাড়া পেলে। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে, ঐ সময়ে আন্দোলনের ইশতেহাররূপে কর্মীদের মাঝে হাতে লিখিত প্রচারিত হয়।

জমিদারদের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের মধ্যে পরে অসহায় প্রজাদের চিরকালের হাহাকারে ধ্বনিত হয়েছে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে। এই ফ্রেমে উপন্যাসের কাহিনী ধারায় বর্ণিত হয়েছে— বাংলার পল্লীজীবনের নীচতা ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় এক আদর্শ যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ও বিশেষ করে তাদের অভিশপ্ত প্রেমকাহিনী। এখানে এসেছে মহাজন ও জমিদার শ্রেণির স্বার্থান্বেষী চরিত্র। আগুনের শেষ, ঋণের শেষ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই– এই চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে যায় প্রগতিশীল সকল আবেগ ও কার্যকলাপও তাতে নষ্ট হয় সমাজ বাধাগ্রস্ত হয় সমাজ সচেতনতা। তবু রমেশরা থেমে থাকে না। তারা আছে বলেই এসব উপন্যাসের নাম জয়ী কক্ষ। সেই আলোকেই আমরা বাস্তব জীবনের স্বপ্ন দেখি। সমাজে এতসব ঘুনেধরা অনিয়ম তার সাথে প্রেমকে একই ফ্রেমে নিয়ে শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' নামক এক নিখুঁত স্কেচ এঁকেছেন। পরিশেষে বলা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু নারীর স্নেহশীলতা ও মানবিক হৃদয়াবেগের রূপকার নন, সামাজিক তথা জাতীয় অনাচার ও সংকটেরও সার্থক রূপকার। আর এ সংকটতে শুধু বর্ণনাদাতাই নন, সংকট নিরসন চেষ্টার উপায় নির্দেশকও বটে।

বাংলার অর্থনীতি হল কৃষিনির্ভর। অর্থাৎ বাংলার মানুষ চাষ করার মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। আগেকার সময়ে অধিকাংশ চাষের জমি থাকতো কিছু ভূস্বামীদের বা জমিদারদের হাতে, এরা ছিলেন সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষ। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের জমিতে ভাগ চাষ করতেন, এবং সেই চাষ থেকে তাদের যে উপার্জন চাষ, জমি রাজস্ব আদায়, চড়া সুদে ধার দেওয়ার কারণে তারা ছিলেন যথেষ্ট বিত্তশালী। যেহেতু সেই সময়কার বিচার ব্যবস্থা আজকের মত এতটা শক্তিশালী ছিল না, তাই বহুক্ষেত্রে গ্রামের জমিদারেরা তাদের নিজ নিজ বাহিনী রাখতেন, এদের পেয়াদা বলা হত। বলা যায় একটি গ্রামের বা জনপদের সমাজব্যবস্থা এইসব সম্ভ্রান্ত মানুষের দ্বারাই পরিচালিত হত। মজার কথা হল, এই সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে কার মর্যাদা বেশি তা জাহির করার লক্ষ্যে বিবদ লেগেই থাকতো।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে 'কুঁয়াপুর' নামক একটি জনপদের পৃষ্ঠভূমিতে। এই জনপদের দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবার হল ঘোষাল পরিবার এবং মুখুজ্জে পরিবার। এই দুটি বিত্তশালী পরিবারের

কর্তাদের মধ্যে মনোমালিন্য থেকে বিবাদ শুরু হয় এবং ক্রমে তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। আবার, শুধুই যে পরিবারের মধ্যে বিবাদ তা নয়, মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছে। শুধু যে দুটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তা নয়। নিজ পরিবারের ভাইদের মধ্যেও এই সমস্যা শাখা বিস্তার করেছে।

প্রধান তিন চরিত্র হলেন—

বেণী ঘোষাল ঃ যিনি বর্তমানে ঘোষাল পরিবারের বড় কর্তা এবং পোড় খাওয়া জমিদার।

রমেশ ঘোষাল ঃ ঘোষাল পরিবারের ছোট সদস্য এবং উচ্চশিক্ষিত। রমেশের জ্যাঠার সন্তানবেশী। রমেশের বাবার সাথে বেণীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেই শৈত্যের আঁচ তাদের দু'জনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

রমা ঃ মুখুজ্জে পরিবারের সদস্য এবং তাদের জমিদারীর প্রধান কর্ত্রী।

'পল্লীসমাজ' এর প্রকাশকাল ১৯১৬। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর তৎকালীন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা যে উপন্যাসে একটা বিরাট অংশ অধিকার করবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'পল্লীসমাজ' সমগ্র বাংলার গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। শরৎচন্দ্রবাস্তব দৃষ্টি দিয়ে সমাজকে দেখেছেন। বিশেষ কোনো সমাজের চিত্র আঁকেন নি। তৎকালীন বাংলার গ্রামগুলোর ছিল কুসংস্কার, অশিক্ষার মোড়কে বাঁধা। শরৎচন্দ্র সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করাতে চেয়েছেন। দারিদ্র্য এ সমাজে ব্যাধিস্বরূপ, ধর্ম সমাজকে রক্ষা করার নামে গ্রাস করেছে। দয়া-মায়া-মমতা এ সমাজে নেই বললেই চলে ভেঙে পড়া পল্লীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে বেণী, গোবিন্দ, পরাণ হালদারেরা। শরৎচন্দ্র রমেশের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে মুখ থুবড়ে পরা সমাজকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের সূচনাই হয়েছে গ্রামীণ দলাদলিকে কেন্দ্র করে। কুঁয়াপুরের জমিদারদের পারিবারিক কলহ উপন্যাস সূচনা থেকে শেষাবধি ঘিরে রেখেছে। মুখুজ্জে এবং ঘোষার এই দুই জমিদার বংশের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ উপন্যাসকে আবর্ত করেছে। ছোট ঘোষাল তরফের সঙ্গে মুখুজ্জেদের বিবাদের জের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রমেশ কুঁয়াপুরে এসেছে। তার স্মৃতিতে তখনো জ্বলজ্বলে শৈশবের সুখস্মৃতি। কিন্তু অতীতের স্বপ্নময় জগৎ প্রবল ধাক্কা খায় বর্তমানের কঠোর বাস্তবানুগ সমাজের কাছে। প্রচ্ছন্ন পারিবারিক কলহ তার গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে ওঠে। শুরু হয় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। বেণী ঘোষাল এবং যদু মুখুজ্জের বিধবা কন্যা রমা ঘোষাল রমেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সামিল হয়। রমার কাছে রমেশ তখনো পর্যন্ত তার বাবার আজীবনের শত্রুর ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে রমেশ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই সে অত্যন্ত সহজভাবেই রমার বাড়িতে গিয়ে তাকে পূর্বেকার মতো 'রাণী' সম্বোধন করে পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সেখানে রমার মাসীর কটূক্তিতে গ্রামীণ সমাজের কুৎসিত দলাদলির প্রথম স্বাদ পায় রমেশ। রমেশ গ্রামীণ দলাদলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বলেই বেণীকে 'বড়দা' বলে ডাকতে পেরেছে।

রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন উপলক্ষে তার বাড়িতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং ধর্মদাস চাটুজ্জের নির্লজ্জ ব্যবহার গ্রাম বাংলার সামাজিক দলাদলির দিকটিকেই প্রকাশিত করে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, উচ্চবর্ণের মানুষদের নীচতা আর স্বার্থপরতা গ্রাম বাংলার সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে টেনে

'পরশুরামের কুঠার', 'অযান্ত্রিক', 'সুন্দরম', 'কালপুরুষ', 'বারবধূ'—এরকম কত গল্প নিয়েই তো আলাপ শুরু করা যায়; কিন্তু যেহেতু আমাকে বেছে নিতে হচ্ছে একটিমাত্র গল্প, বিশেষ কিছু কারণে 'অযান্ত্রিক'কে বেছে নিচ্ছি আমি। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে নিসর্গের বিবিধ অনুসঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে অনেক লেখকই লিখেছেন; কিন্তু জড় পদার্থের সঙ্গেও যে মানুষের অপূর্ব সম্পর্ক তৈরি হতে পারে সেই বিষয়টি সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। এই গল্পটি সেই অদ্ভুত সম্পর্কের মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছে।

গল্পের শুরুতেই আছে বিমল আর তার ভাঙাচোরা ট্যাক্সির বিবরণ ঃ 'বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়; তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা কোর্ড, প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। ...তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙা, তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো; সে এক অপূর্ব শ্রী।'

দেখতে কদর্য হলেও গাড়িটি করিতকর্মা। রাস্তায় গর্জন তুলে চলে সে রাজার মতো দূর থেকেও সবাই টের পায় বিমলের গাড়ি আসছে। দুর্গম-ভাঙাচোরা-ভয়াবহ জংলীপথে বা ঘোর বর্ষার রাতে কোথাও যাওয়ার জন্য আর কোনো গাড়ি না পাওয়া গেলেও বিমলের গাড়ি প্রস্তুত। তাকে আসতে দেখলে সবাই সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়, যতই বিরক্ত হোক না কেন লোকজন, কিচ্ছুটি বলা যাবে না— 'সবচেয়ে বেশি ধুলো ওড়াবে, পথের মোষ ক্ষ্যাপাবে আর কানকাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ি। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। তটাং চটাং মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দেবে— মশাই বুঝি কোনো নোংরা কম্ম করেন না, চেঁচান না, দৌড়ান না। যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়িটা।'

বিদ্রুপ করে লোকে নানা নামে ডাকলেও বিমলের কাছে এই গাড়ি একটা আদরের নাম পেয়েছে— জগদ্দল। 'এ নামেই বিমল তাকে ডাকে। তার ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরোটি বছরের সাথী এই যন্ত্রমন্ডটা, বিমলের সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।' কিন্তু কেবল অন্নদাতা বলেই যে জগদ্দলের জন্য বিমলের এক ভালোবাসা, তা নয় তাদের সম্পর্কটি দারুণ মানবিক। জগদ্দলের সব দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-আর্তি বিমল বুঝতে পারে। এমনকি তার সঙ্গে কথাও বলে বিমল— "সন্দেহ হতে পারে, বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া পায় কি ? এটা অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু বিমল জগদ্দলের প্রতিটি সাধ-আহ্লাদ, আবদার-অভিমান একপলকে বুঝে নিতে পারে। ...'ভারি তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল ? তাই হাঁসফাঁস কচছিস ? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।' জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বটগাছের ছায়ায় থামিয়ে কুঁয়ো থেকে বালতি ভরে ঠান্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয় বিমল। বগ বগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।" কিংবা —'কি করব জগদ্দল! এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পূজোয় কটা ভালো রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড় পরাবো, নিশ্চয়।'

শুধু কি বিমল বোঝে জগদ্দলের ভাষা ? না, জগদ্দলও বোঝে বিমলকে —'জগদ্দলও যে মানুষেরই মতো...এই কম্পিটিশনের বাজারে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে। আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরিব, জগদ্দল যেন এই সত্যটুকু বোঝে।'

জগদ্দল সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য সইতে পারে না বিমল। সহকর্মী ট্যাক্সিচালকরা এই ভাঙাচোরা গাড়ি পাল্টে নতুন গাড়ি কেনার পরামর্শ দিলে সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়, নতুন গাড়ি তার কাছে 'চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে'। জগদ্দলের ব্যাপারে কেউ কথা বললেই বিমলের মনে হয়, ওরা যেন তার 'প্রাইভেট' ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে সারা দিন বসে থেকেও ভাড়া জোটে না তার, তবু জগদ্দলের যত্নআত্তির শেষ নেই। হয়তো সে জন্যই অন্য সব গাড়ি এক-আধবার কামাই দিলেও 'জগদ্দলের উপস্থিতি ছিল সূর্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত', দেবতার কাছেও বিমলের একটিই মাত্র প্রার্থনা ছিল, 'হে বাবা, জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ বয়সে আর সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন? জগদ্দলের বয়স হয়েছে, কতই বা আর ভার সবইবে সে? একসময় সব কঠিন চড়াই-উতরাই 'চিতাবাঘের মতো একদমে সোঁ সোঁ করে' পার হয়ে যেত, এখন সেটি পার হতে তার দম ফুরিয়ে যায়, পিস্টন ভেঙে যায়। ...একটা না একটা উপসর্গ লেগেই থাকে। ...আজ ফ্যানবেল্ট ছেড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে শর্ট শার্কিট হয়। 'উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুর দূর করে। তবে কি শেষে সত্যই বিমল ছুটি নেবে?'

'না আমি আছি জগদ্দল; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই। বিমল প্রতিজ্ঞা করে। 'কলকাতায় অর্ডার দিয়ে প্রত্যেকটি জেনুইন কলকব্জা আনিয়ে ফেলে বিমল। নতুন ব্যাটারি, ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাঙ্গল, পিস্টন – সব আনিয়ে ফলল। অকৃপণ হাতে শুরু হলো খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিস আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে, বিমল যেন ক্ষেপে উঠেছে। অর্থাভাবে– বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোশটা পর্যন্ত।'

না, জগদ্দল কেবল তার অন্নদাতা নয়। অন্নদাতা হলে সর্বস্ব ত্যাগ করে সারিয়ে তুলতে চাইত না, বরং পাল্টে আরেকটি গাড়ি কিনে নিত। বিমল নিঃসঙ্গ, জগদ্দল তার একমাত্র সঙ্গী, হয়তো জীবনসঙ্গী, কখনো বা সন্তানতুল্য।

অনেক চেষ্টা করেও জগদ্দলকে আর আগের অবস্থায় ফেরাতে পারে না বিমল। তার চেহারা বদলায় বটে,প্রাণশক্তি আর ফেরে না। 'বিমলের মনের ভেতরে বেদনা ছড়ায় একটা সন্দেহ। জগদ্দল চলছে ঠিকই, কিন্তু কই সেই স্টার্টমাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি?' নানাভাবে জগদ্দলকে পরীক্ষা করলো সে, কিছুতেই কিছু হলো না, বিমল বুঝে বুঝে গেল 'জগদ্দলকে যমে ধরেছে।... এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যান নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।'

তারপর? লেখকের চোখ–ভিজে –ওঠা অনবদ্য বর্ণনা পড়ুন প্রিয় পাঠক, 'আমি শুধু রৈনু বাকি ...পরিশ্রমী বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল। কিন্তু আমারও তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোকের মতো গা ছেয়ে ফেলেছে সব। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই, যেদিন জগদ্দলের মতো এমনি করে হাঁপিয়ে আর খুঁড়িয়ে আমাকেও বাতিল হয়ে যেতে হবে। ...জগদ্দল আগেই যাবে বলে মনে হচ্ছে, তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভালো মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।' যা কোনো দিন হয়নি, তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতো

শুকনো ঠান্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু- ফোঁটা টলমলে উষ্ণ জল।

আহা! কি মায়া এই বর্ণনায়, কী দিব্যকান্তি এই সম্পর্ক! গল্প আসলে এখানেই শেষ, তবু লেখক আরেকটু এগিয়ে দেখেন, বিমল মহুয়ার বোতল নিয়ে নেশা করতে বসেছে আর এক ব্যবসায়ী এসেছে তার কাছ থেকে পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া লোহালক্কড় কিনতে। অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি তখনই ঘটে। তারা জগদ্দলকে কিনতে আসেনি, সে কথা বলার সাহসই নেই তাদের; কিন্তু বিমল তাকে পুরনো লোহালক্কড় হিসেবেই বিক্রি করে দেয়। আর তারপর, 'শোন আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তারপরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠেছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে বিমল, ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং, ছিন্নভিন্ন ও মৃত জগদ্দলের জন্য কবর খুঁড়ছে।'

আমরা যেমন করে আমাদের প্রিয়জনদের শেষবিদায় জানাই, গভীর শোকে যেমন আমাদের চৈতন্য 'অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে' তলিয়ে যায়, জগদ্দলের শোকে বিমলেরও তেমনই হচ্ছে। তার যে ওই একজনই ছিল আপনজন।

যন্ত্র দানব নয় ঃ 'চৌদিকে ধায় সমর তরঙ্গ'—শুরু হয়েছে আ-বিশ্ব সমর। তখন দুনিয়ার একটি মাত্র রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র। ফলে সংকুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার। সাম্রাজ্যলিপ্সু দম্ভ তাই বন্দুক ঠুকছে কৃষ্ণসাগরের তীরে। "ফিনল্যান্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যাপ্ত সুদীর্ঘ পনের শত মাইল ফ্রন্ট। কাতারে কাতারে সমবেত যন্ত্রপূঢ় রক্তচক্ষু। করাল নরমেধের আয়োজনে বিংশ শতাব্দী শিউরে উঠছে রুশের সীমান্তে। 'এদিকে কিছু আগেই বিলিতি যন্ত্রসভ্যতায় তিতিবিরক্ত আরতের কবিগুরু নগর সভ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। চেয়েছেন আরণ্য জীবন। আমরাও ভুলে গেছি মানবসভ্যতা সৃষ্টির সেই আদি কথাগুলি —"There is no tool without man and no man without tool; they came into being simultaneoulsy and are indisolubly linked to one another."

অথচ "আমাদের সাহিত্য, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংস্কৃতি (যা শহরে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি) যন্ত্রযুগ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা একটা সর্বভুক দানবীয় ভীতির সাথে মিশে আছে— যন্ত্র যেন সবকিছু ভালোকে, আমাদের ভাবনাশক্তি, আত্মিক শক্তিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। যন্ত্র যেন ভারতের সুপ্রাচীন সুমহান সংস্কৃতিবোধের কাছে এক বিদেশী আগন্তুক, যেন এক সামগ্রিক সংঘাত, দুর্যোগ, দ্রুত ধবংসের প্রতিনিধি, অসন্তোষের স্রষ্টা।

কিন্তু সত্যিই তো তা নয়। যন্ত্র মানবজীবনে মাঙ্গল্যরচনায় সবচাইতে বড় উপাচার, কল্যাণের ধারাপ্রবাহিনী, সেই আদিমযুগ থেকে শুরু করে আজও মানুষ সকল প্রতিকূলতাকে জয় করবার জন্য কত কলাকৌশল রচনা করে যাচ্ছে। যখন তা কল্যাণী দৃষ্টিতে পরিচালিত হচ্ছে না তখনই নেমে আসছে অশান্তির আঘাত। বাংলা সাহিত্যে 'যন্ত্রদানব' নামে একটি কথার খুবই চলন হয়েছে। কোন মনীষী প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন জানি না। যিনিই করে থাকুন, এর জন্য তিনি প্রশংসা পাবেন না। কারণ, এই কথাটার ভেতর সবচেয়ে জঘন্য কুসংস্কার আশ্রয় করেছে। বলতে গেলে এর চেয়ে বড় কুসংস্কার আর বোধহয় নেই। সমস্ত সভ্য মানুষের প্রগতিশীল ফিলসফিকে কবর দেবার একটা মূঢ় সনাতনী অপচেষ্টার পরিচয় এই যন্ত্রদানব কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে। কথা নেই, বার্তা নেই, কোন

সঙ্গত কারণ নেই অথচ যন্ত্রকে দানব আখ্যা দেওয়া, কোন মনোবৃত্তি থেকে এর উদ্ভব ? মধ্যযুগীয় দৃষ্টিমোহ থেকে যারা আজও মুক্তিলাভ করতে পারে নি, ইতিহাসের পাতা যারা উল্টে দেখেনি, অথবা দেখেও কিছু অর্থ বোধগামী হয়নি, যন্ত্রদানব কথাটি তাদের মুখের বুলি।

নামকরণের সার্থকতা ঃ সমসময়ের লাঞ্ছিত মানবাত্মা জগদ্দলের প্রতীকে আত্মপ্রকাশ করেছে। পার্বতীকে না পেয়ে একদিন দেবদাস নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছিল। আর জগদ্দলকে হারিয়ে বিমল এ যুগের কন্টকিত ঐশ্বর্যের পীড়নে হেরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মানবতাবাদ। জগদ্দল সেই গণ-মানসের, গণ দেবতার প্রতিমূর্তি। 'অযান্ত্রিক' গল্পটি তাই 'যন্ত্রযুগ' নয়, 'যন্ত্রমানবতা ও নয় গণ- দেবতার অন্তরমোক্ষম করা বিলুপ্ত প্রায় মানবিক মূল্যবোধ; "স্থাবর ও জঙ্গমের মিলনসেতু।" এই গল্পের আর একটি দিক রয়েছে। হাজারীবাগের কোন এক অখ্যাত গোঁয়ার ট্যাক্সিচাললকদের মনের কথা হয়ে ওঠে। সুবোধ ঘোষের উত্তরসূরী এক সাহিত্যিকের জীবনের ঘটনায় এ সত্যের প্রমাণ মেলে।

অশ্রুসিক্ত হাসির ফেরিওয়ালা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে

মানিক বেরা
ষষ্ঠ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

সাহিত্যক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯১৫–১৯১৬ সালে। পৃথিবী জুড়ে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্রাদিত্যের এক পার্শ্বে 'বীরবল' আরেক পার্শ্বে শরৎচন্দ্র নিজ-নিজ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। বঙ্গভারতীয় সেই পরম ঐশ্বর্যের দিনে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তরুণ বিভূতিভূষণ সারস্বত সমাজের মালাচন্দন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তূর্যধ্বনিতে দিগদিগন্ত মুখরিত করে তিনি আবির্ভূত হননি; স্নিগ্ধ সরসতায় পরিচিত পরিবেশকে সুমধুর করে তাঁর প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেচে। তাঁর লেখনী যেমন মধুক্ষরা, তাঁর সৃষ্টিও তেমনি অফুরন্ত। কিন্তু, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, প্রথম প্রকাশের পর সুদীর্ঘ একুশ-বাইশ বৎসর অতিক্রান্ত না হবার পূর্বে তিনি গ্রন্থাকারে কোনও রচনা প্রকাশ করেননি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এর প্রথম গল্প-সংকলন 'রানুর প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। দীর্ঘবিলম্বিত প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত করে তিনি সেদিন থেকেই সাহিত্য রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। অসংখ্য সমস্যান্তরে জর্জরিত জীবনের জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে এর চিরন্তন রসপ্রবাহের উৎস সন্ধানই তাঁর শিল্পী মানসের মুখ্য ধর্ম। ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোটো দুঃখকথার মধ্য দিয়ে জীবনের যেসব অশ্রু-হাসির কাহিনী নিতান্তই সহজ-সরল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি অফুরন্ত রসের ভান্ডার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের অতি পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে শাশুড়ি-বউ, ননদ-ভাজ, কর্তা-গিন্নি, নাতি-ঠাকুমার, পরিহাস রসিকতার মধ্যে যে অন্তঃপুরচারী রস অবগুণ্ঠিত, পারিবারিক শাসন-শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের মধ্যেও যে চিরন্তন কিশোর-কিশোরীর পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার মিলন-লীলা অব্যাহত, তাদের মজলিসি আড্ডায় বন্ধুদের গানগরের মধ্যে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়েও যে জীবন রস উজ্জ্বলিত, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রধানত সেই রসেরই

পরিবেশন।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা মুখ্যত হাস্যরসিক হিসেবেই। এবং সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। হাস্যরসিক কথাটি অবশ্য বড় ব্যাপক এবং ব্যাপক বলেই অস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যে স্থূল এবং অশ্লীল ভাঁড়ামো থেকে রসিকতাও হাস্যরসের এলাকাভুক্ত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক গল্পেরও প্রকারভেদ আছে। তামাশা, কৌতুক ও রঙ্গরস থেকে অতি উচ্ছ্বাসের রসিকতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্বর ও পর্যায়ের হাসি তিনি দু-হাতে ঘড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু হাস্যরসিক হিসাবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর হাসি যেমন সংযত ও সুন্দর, তেমনি তা নির্দোষ ও নির্মল। তা কখনওই ব্যক্তিগত অসূয়া বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়, এবং সেই জন্য তাতে কুটিল শ্লেষ বা তীব্র বাসের কশাঘাত থাকে না। পক্ষান্তরে সে হাসি কোনও বিশেষ মুহূর্ত বা কৌতুককর ঘটনা-সংস্থানের ওরও সর্বদা নির্ভর করে না। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলেই সে হাসির উদ্ভব।

বর্তমান বিশ্বের যান্ত্রিকতার মধ্যে মানুষের হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছে। সাহিত্য ও শিল্পের প্রথাগত সংস্কারে আবেষ্টনিক মধ্যে সচেতন পাঠক আর ভূষি পাচ্ছে না। আধুনিক পর্বে সাহিত্যিকদের জটিল মননের আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা মানুষকে আর আগের মতো আকর্ষণ করে না। তাই নান্দনিক ভূমির মধ্যে মানুষ যখন আঙুর, তখন সেই সময় একদল সাহিত্যিক বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের অবক্ষয়, হাসি, কান্না, ভালোলাগা, মন্দলাগা, প্রভৃতি বিষয়কে আশ্রয় করে প্রয়াসী হন। এঁদেরই মধ্যে রয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। নতুন আঙ্গিকে পরিবর্তমান সমাজে বিষয়গুলি কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। এই উত্তর আধুনিক গল্পগুলি বাঙালি পাঠকে কেবল যে নান্দনিক ভূমি দেয় শুধু নয়, সেই সঙ্গে চিরাচরিত ইতিহাসের সত্যতা বিচার করে।

সাহিত্যের আসরে প্রথমতম রচনাতেই যাঁরা সম্বর্ধিত হয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই দলে।১৯১৫–১৬ সালের আষাঢ় মাসে 'প্রবাসী'র গল্পর প্রতিযোগিতায় বিভূতিভূষণের প্রথম লেখা গল্প 'অবিচার' পুরস্কার লাভের সম্মান পায়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে। আজিকার গৌরবোজ্জ্বল দিনের সূচনা সেই দিনই এবং বাংলা সাহিত্যে আরো একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছিল।

অসংখ্য সমস্যাভারে জর্জরিত জীবনের জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে এর চিরন্তন রসপ্রবাহের উৎসসন্ধানই তাঁর শিল্পীমানসের মুখ্য ধর্ম। যুগের দাবিতে জীবনসমুদ্র যেখানে বিক্ষুব্ধ সেখানে তাঁর স্থান নয়। মর্ত্যের চিরপ্রবহমান জীবন-নির্ঝরিণীর ওপ্রান্তে বসে তিনি রসামৃতের সাধনায় তন্ময়। 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা'র মধ্য দিয়ে জীবনের যে-সব অশ্রু-হাসির কাহিনী নিতান্তই সহজ সরল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যেই তিনি অফুরন্ত রসের ভান্ডার নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। শুধু বহুবিচিত্র ছোটগল্পেই নয়, উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রতিফলনেও তার সৃজনী শক্তির নব-নব পরিচয় রসগ্রাহী পাঠক-সমাজকে পরিতৃপ্ত করছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এইসব সৃজনী শক্তির নব-নব পরিচয় আমি এই উক্ত প্রকল্প পত্রে বাস্তবায়িত করেছি। যা আমার প্রকল্প পরে মূল উদ্দেশ্য রূপে গৃহীত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করলে তিনি মহল খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষ বিভূতিভূষণ, দার্শনিক বিভূতিভূষণ ও শিল্পী বিভূতিভূষণ। মানুষ বিভূতিভূষণ সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল

রসিকচিত্তের অধিকারী। জীবনে গভীর রহস্য প্রধানত বেদনার মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। মর্মবিদারী সে বেদনার অশ্রুতে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। এই তো দার্শনিকের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার লীলা তো কোন খেয়ালির পুতুল নিয়ে খেলারই সমকক্ষ। আর শেষ পর্যন্ত যা পুতুলখেলার অধিক কিছুই নয়, তা নিয়ে মানুষের এত আসক্তি, এত অশ্রুপাত, এত উল্লাস, দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় হাসির জিনিস আর কী আছে ? বিভূতিভূষণের আছে এই দৃষ্টি, এই দার্শনিক মন। সেজন্যই তাঁর মানবসত্তা জীবনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে যে আনন্দ- বেদনার কাহিনীগুলোর সংগ্রহ করে আনে তার দার্শনিক-সত্তা সে সব কাহিনীর কুশীলবদের Structing ও Fretting দেখে না হেসে পারে না। মানব জীবনের গভীরে এই মায়ার খেলা দেখেই সম্যক দ্রষ্টা দার্শনিকের মুখে ফুটে ওঠে হাসি। সে হাসি বিদ্রুপের হাসি নয়। মায়াগ্রস্ত মানুষেরপ্রতি সমবেদনার অশ্রু মাখানো আছে সে হাসিতে। এই অশ্রুসিক্ত হাসিই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের স্থায়ী ভাব। বিভূতিভূষণ যে রসই পরিবেশন করুন না কেন, হাস্যরসই তাঁর অঙ্গীরস। তাই জীবনের গভীর দুঃখও তাঁর হাতে উৎকৃষ্ট হিউমার বা হাস্যরসে রূপান্তরিত হয়।

বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে মানুষের সুখদুঃখের মূলে আছে তার নিজেরই অনেকখানি হাত। চরিত্রের মধ্যেই যেমন ট্রাজেডির বীজ নিহিত থাকে, তেমনি মানুষেরই কোনো মূঢ় আচার-আচরণ বা কামনা-বাসনা ও ভক্তিবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত থাকে হাসির উপাদান; বাহ্যিক পরিবেশ বা ঘটনা-সংস্থান কিংবা জীবন-রসমঞ্চেরঅদৃশ্য পরিচালকের খেয়ালখুশিতে তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মূল উপাদান লুকিয়ে থাকে চরিত্রের মধ্যেই।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় মহলে আছে শিল্পী বিভূতিভূষণ। এই শিল্পী একাধারে কবি ও পরিহাসরসিক। তাই তাঁর সাহিত্যের একদিকে যেমন আছে সুকুমার সৌন্দর্যবোধ ও উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনা, তেমনি অন্যদিকে আছে কৌতুক পরিহাসরসিক চিত্তের সরসতা। এই উভয় গুণের সম্মিলনে তাঁর শিল্পকর্ম রস মধুর কাব্য সুষমা মন্ডিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ভাবাবেগের আত্যন্তিকতা মানুষের আচার-আচরণে অসংগতি সৃষ্টি করে কিভাবে উপহাস্য হয়ে উঠেছে তার উদাহরম 'শ্যামলরানি', 'ধর্মতলা-টু কলেজ - স্কোয়ার', 'সম্পত্তি' ও 'কুইন অ্যান' গল্প।

বাংল কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা মুখ্যত হাস্যরসিক হিসেবেই। এবং সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বিভূতিভূষণের হাস্যরসাত্মক গল্পেরও প্রকারভেদ আছে। তামাশা, কৌতুক ও সরগরম থেকে অতি উচ্চাঙ্গের রসিকতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়েরহাসি তিনি দু-হাতে ঘড়িয়ে চলেছে। কিন্তু হাস্যরসিক হিসেবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর হাসি যেমন সংযত ও সুন্দর, তেমনি তা নির্দোষ ও নির্মল। তা কখনোই ব্যক্তিগত অসূয়া বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়, এবং সেজন্যই তাতে কুটিল শ্লেষ বা তীব্র হাস্যে কশাঘাত থাকে না। পক্ষান্তরে সে হাসি কোনও বিশেষ মুহূর্ত বা কৌতুককর ঘটনা-সংস্থানের ওপরও সর্বদা নির্ভর করে না।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আছে দার্শনিকের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার লীলা তো কোন খেয়ালির পুতুল নিয়ে খেলারই সমকক্ষ। আর শেষ পর্যন্ত যা পুতুল

খেলার অধিক কিছুই নয়, তা নিয়ে মানুষের এত আসক্তি, এত অশ্রুপাত, এত উল্লাস।

মানবজীবনের গভীরে এই মায়ার খেলা দেখেই সম্যকদ্রষ্টা দার্শনিকের মুখে ফুটে ওঠে হাসি। সে হাসি বিদ্রুপের হাসি নয়। মায়াগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনার অশ্রু মাখানো আছে সে হাসিতে। এই অকৃত্রিম হাসিই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের স্থায়ী ভাব। বিভূতিভূষণ যে রসই পরিবেশন করুন না কেন, হাস্যরসই তাঁর অঙ্গীরস। তাই জীবনের গভীর দুঃখও তাঁর হাতে উৎকৃষ্ট হিউমার বা হাস্যরসে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে কেরানী কথা

বর্ষা দাস

৬ষ্ঠ পাঠ পর্যায় (বাংলা অনার্স)

ভূমিকা ঃ 'কেরানী' কথাটি বাঙালী সমাজে এতটাই বহুল-প্রচলিত যে, আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন কথাটির জন্মের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। তা কিন্তু নয়। বস্তুত, ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরি সাহেবের 'ডিকশনারি অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। সেখানে তিনি ইংরেজি 'ক্লার্ক' শব্দটির বাংলা অর্থ করেছেন 'মুন্সী' বা 'মুহরি'। ১৮৩৪ সালে রামকমল সেন প্রকাশ করেছেন তাঁর অভিধান 'ডিকশনারি ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি'। এখানে 'ক্লার্ক' শব্দের বাংলা তর্জমা করা হয়েছে 'উপদেশক', 'মুহরি' বা নকলনবিশ, অথবা মৎসুদ্দি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে 'কেরানী' বা 'ক্যারানি' শব্দের মূল খুঁজে পাচ্ছেন 'শূন্য পুরাণ'-এর 'কন্নি' শব্দে। এই শব্দের উৎস পর্তুকিজ 'Escrevente' শব্দ, একইভাবে, হরিহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার অভিধান 'কন্নি' ও 'Escrevente'–এই দুটো শব্দই উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনার সূত্র ধরে একথা বলা যায় যে, 'কেরানী' শব্দের উৎপত্তি চলিত এবং মান্য বাংলা ভাষায় উনিশ শতকের কোন একটি সময়ে হয়েছিল। সম্ভবত সুলতানি বাংলায় এই শব্দের প্রচলন ছিল না। তার আগেও নয়, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, যে শব্দটির সাহেবদের আসবার পরেই বাংলা ভাষায় আগমন ঘটে। আর উনিশ ও বিশশতকের বাংলা সাহিত্যের ইতহাসে এই সমাজের জীবন-চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। সেই তালিকায় বাংলা কথা-সাহিত্যও সামিল। এই ধারায় উনিশ শতকে অজ্ঞাত লেখকের রচনা 'কেরাণী পুরাণ' যেমন হয়েছে। তেমনি রয়েছে বিশ শতকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ছোটগল্প 'শুধু কেরানী'।

বিশ্লেষণ ঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষে উনিশ শতকের আগে কেরাণীরা ছিলেন না– এমন কথা সম্পূর্ণত সঠিক নয়। বহুআগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের কেরানি বিভিন্ন রকমের দপ্তরের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে এই পরম্পরার একটি দীর্ঘ ও সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ধারার সূত্রপাত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই। আর সেই সূত্রে উদয় হয়েছে কেরানী সম্প্রদায়ের, যারা পরম্পরাহীন, জাতি পরিচয় ছাড়া, অল্প লেখাপড়া জানা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের সবচেয়ে নিচু স্তরের কর্মচারী। 'নিচু স্তরের' কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের দুর্দশার প্রাথমিক আভাস। সাধ ও সাধ্যের অসীম ফারাক তাদের জীবনের প্রতি পদে বহন করে এনেছে সীমাহীন

দুর্দশা। সেই দুর্দশাঘন জীবন-চিত্র বাংলা সাহিত্যে বারে বারে উঠে এসেছে। উনিশ ও বিশ শতকের নানা সাহিত্য-কর্মের মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে। উনশ শতকে চন্ডীচরণ ঘোষের লেখা 'কেরানী দর্পণ' নাটক, অজ্ঞাত রচয়িতার 'কেরানী পুরাণ' যেমন সেই সারিতে রয়েছে, তেমনি বিশ শতকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর বউ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী', নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'কেরানী', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও রঙ্গ-নাট্যম্ অভিনীত 'কেরানীর জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের বিখ্যাত 'বাঁশি' কবিতা ইত্যাদি নানা রচনায় কেরানী-সমাজের দুর্দশাঘন ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পপত্রে দুই দশকের বাংলা কথা-সাহিত্যের এই বিষয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় দুটি রচনাকে আমরা গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে রয়েছে উনিশ শতকের 'কেরাণী পুরাণ' ও বিশ শতকের প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'শুধু কেরাণী'।

'কেরাণী পুরাণ'-এর লেখক অজ্ঞাত। গ্রন্থটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস থেকে শ্রী তারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আখ্যানধর্মী এই রচনাটির বিষয়বস্তু কয়েকটি 'পর্বে' বিভাজিত—

আদিপর্ব ঃ এই পর্বের শুরুতেই বলা হয়েছে বেলা ৯টা ১০ সময় নানান রকমের (কার ধুতি চাপকানপরা, কার ধুতিকোট, কার মাথা খোলা বা ক্যাপ আছে, পোশাক পরিধান করে ট্রামে-বাসে করেব্যস্ত হয়ে চলেছেন। এদের নাম 'কেরানি', এখন প্রশ্ন হল 'কেরাণী' 'ঈ' হল কেন ? 'ঈ' স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়, লেখকের মধ্যে এর কারণ হলো —"স্ত্রীলোকের সঙ্গে উয়াদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে"· যেমন স্ত্রীলোকের মতো ভীতু স্বভাব, পাছে সাহেব বিরক্ত হন। সবসময় এই ভয়, ব্যবসা করলে পাছে ক্ষতি হয়, চাষ করলে যদি 'কমলাঙ্গে' সূর্যের কিরণ পরে এইসব ভয়েই তারা আকুল। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য ও খননকে ভয় করেন না।

"সতী যেমন পতিতাকে কখনো পরিত্যাগ করেন না, নানাপ্রকার অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া ও পতিতেই রত থাকেন কেরানিও যতই ক্লেশ কষ্ট পান না কেন প্রাণের কেরাণীগিরি ছাড়েন না।"·

এরকম নানা কারণে কেরানি লিখত 'ঈ' ব্যবহার করতে হয়।

এই পর্বের শেষে দেখা যায় 'কেরানি' নামকরণের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে— কে রানী এরা জানেন না বলেই এদের নাম কেরানী, রানীর রাজ্যে বাস করেন। তাতেই খেটে মরেন কিন্তু পরস্পরের জানাশোনা নেই। গভর্মেন্টি অফিসে ভালো কাজ করেন এবং উচ্চ বেতন ও পান এদের পরামর্শে অনেক সমস্যার সমাধানও ঘটে কিন্তু এই কথা রানী-র কানে উঠে না ফলে জনসমাজেও এদের প্রশংসা হয় নারানী নারী শ্রেষ্ঠ লোক ছিল নারী শ্রেষ্ঠ। তাই রানী শব্দ লক্ষ্মী অর্থে আমরা অভিধান অনুসারে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্মীকে কেরানীরা চেনেন না বলে এদের নাম 'কেরানি' হয়েছে।

অফিস পর্ব ঃ

এই পর্বে বলা হয়েছে কেরানী তিন প্রকার :

(১) কুলীন

(২) মৌলিক

(৩) এবং বংশজ।

(১) কুলীন মূলত ২০০–৪০০ টাকা, (২) মৌলিক ৩০–১০০ টাকা এবং (৩)বংশজ ১০০–২০০ টাকা বেতন পেয়ে থাকেন।

আবার ৩০ টাকার নিচে যারা বেতন পান তাদের বলে পচা মৌলিক এবং ৪০০ টাকার উপরে যারা বেতন পান তাদের বলে মুখ্য কুলীন কিন্তু বিদয় কিংবা বুদ্ধি অনুসারে এদের পদোন্নতি হয় না।

তৃতীয়ত, "গৃহপর্ব' : কেরানীদের মধ্যে পান দোষ অল্প।

"ছাই পায় না মুড়কি জলপান।"·

অধিকাংশ কেরানীদের খাওয়া পাওয়া চলে না, অনেক সময় শীতবস্ত্র গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মবস্ত্র শীতকালে পরতে হয়, সারা বছর পূজা কাপড়ের দেখা, মেয়ের বিয়ের দেখা সমস্ত জীবনেও শোধ হয় না। আবার অফিসের সময় পৌঁছাতে না পারলে কিংবা কামাই হয় এই ভয় থাকে।

"অর্থকষ্ট বড় মন্দ হয়।"·

যদিও খুব কষ্ট হয় দিনযাপন করা, কিন্তু এদের গৃহে অনেকের চরিত্র ভালো হয়ে থাকে।

কিন্তু কুলীন এবং বংশজ কেরানীদের অবস্থা মৌলিক কেরানিদের মতো মন্দ নয়। সংসারে কোন টানাটানি নেই, ছেলে- মেয়ের লেখাপড়া অনায়াসে হয়। এদের জীবনটাই সুখেই কাটে কেউ কেউ আবার গাড়ি ঘোড়ায় চাপতে পারেন এবং মৃত্যুকালে কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করে রেখে যান। উচ্চ বেতনের কেরানি অপেক্ষা খুব কম লোকই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করে, এদের দিনে এমন কোন কাজ করতে হয় না যার ফলে রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে,

"অধিকাংশ কেরানি ঈদ টানাটানির মহলে বাস করেন এবং ঋণদেবীর অধীনস্থ।"·

পূজার সময় ঃ ছোট কেরানির বাড়ি দুর্গোৎসবের ধূমে অন্ধকার। 'দুর্গোৎসব নয় দুর্গা বিপত্তি'· "পূজার সময় সকলেরই অধিক খরচ কাহার কাছে বা ধার পাবেন ?"·

এটা ভাবতে ভাবতে তার ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগলো তখন তিনি বসতে না পেরে ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কানে শুনতেই তার বুকে যেন শীল বিঁধছে। এমন সময় তার ছোট কেরানির স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে বলেন—"ওকি উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছ কেন ? আজ ষষ্ঠী এখনো কাপড় আনিলে না বাচ্চাদের তো আর থামিয়ে রাখিতে পারি না।"

ছোট কেরানির মৃত্যু : দুই তিন দিন ধরে জ্বর হয়েছে, তবু অফিসে যেতেই হবে না হলে বেতন কাটা যাবে। কেরানির মাইনে কাটা গেলে ১৫ দিন বাজারের খরচ কমে যাবে। ক্রমশ জ্বর ১০৫ ডিগ্রিতে বাড়তে লাগলো, অফিস যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, গিন্নি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন— "ওগো তুমি আমায় কার হাতে সঁপে দিয়ে গেলে ? আমাদের মায়া একেবারে বেশ করে পুলিশে গো ? আর আমাদের মুখ পানে কে চেয়ে দেখিবে গো ? কাল খাবার চাল ঘরে নেই। আমার অবগত ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব গো ? ওগো তোমার বড় মেয়ে বিবাহের সময় বাড়ি বাধা দিয়েছিলে; এখন যে ওদরাণ হয়নি গো; পাচ্ছে আমাদের কষ্ট হয় বলে তুমি যে হেঁটে খুঁটি যেতে গো; বড় মেয়ের এমন দশা হওয়া অবধি তুমি যে অফিসে জল খাবার না খেয়ে তার সংস্থান কচ্ছিলো গো, তুমি যে আমাদের আস্ত কাপড় পরাইযা আমাদের ছেঁড়া কাপড় পড়িতে গো, এত মায়া কেমন করে একবারে ভুলিলে গো"।

উদ্ধার পর্ব ঃ এই পর্বে দেখা যায় কেরানীদের দুঃখ কষ্টের কথা এমনভাবে স্পষ্ট হয়েছে বলে

অএনক কেরানির মনে কষ্ট পেয়েছেন আবার কেউ কেউ রেগে গিয়ে বলেন যার জন্য করি চুরি সেও বলে চোরহরি' ।

কেরানীদের মনে কষ্ট দিয়ে কিংবা তাদের ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করে আমোদ করা এই পুরাণের উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কেরানির কষ্টের কথা প্রকাশ করে বড়লোকদের দয়া উদ্দীপন করা। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের উন্নতি সাধনের জন্য যেমন সভা রয়েছে তেমনি কেরানীদের অবস্থা উন্নত করার জন্য সভা চাই। স্কুল এবং কলেজে যতই কেরানির আগমন ঘটেছে ততই তাদের কদর কমেছে। সেকালে কেরানী লেখাপড়া না জেনেও যেরকম সম্মান পেয়ে চাকরি করে গেছেন এখন কেরানী সুপরিচ্ছেদধারী এবং কৃতবিদ্য হইয়াও তাহার দশঙ্কের এক অংশের সম্মান বা আদর পান না।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী' গল্পটির ঘটনা বস্তুর সারার্থমর্মসার : গল্পটিতে কোন অতিকথন নেই। নববিবাহিত কেরানী তার বধূকে যেভাবে ভালোবাসায় আগলে রাখে এবং বউটিও একইভাবে – সে প্রসঙ্গেই গল্পটিতে বিবৃত। ফুলের মালা এনে দিয়েছে স্বামী তার স্ত্রীকে। ট্রামে না এসে ট্রামের ভাড়া বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে ফুলের মালা কিনে আনতে হয়েছে কেরানীকে। এ নিয়ে স্ত্রী বলে, কেন সে কষ্ট করে হেঁটে এলো, এ ফুলের মালা আ আনলে তো হতো, স্বামীর কষ্ট হয়েছে বলে স্ত্রী-এর অভিমান। প্রায়ই হেঁটে আসে অফিস থেকে, ট্রাম ভাড়া বাঁচিয়ে তা দিয়ে 'সুতিকা' রোগগ্রস্তা স্ত্রী-র চিকিৎসা খরচ যোগানোর জন্য। শুধু স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় না। শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটি বারের জন্য এতদিনকার মিথ্যা কারণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বলে—

"আমি মরতে চাইনি ভগবানের কাছে রাত দিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল" ।

অভিযোগ করে না। দু'জনের কেউই ভগবানের প্রতি স্ত্রীর বেঁচে থাকার ইচ্ছে এবং স্বামীর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা-উভয়ের হৃদয়গত ক্রন্দন, দারিদ্র্য আঘাতে জীবনের এ-অপমৃত্যুর যে আর্তনাদ তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপযুক্ত ভাষা শৈলীর মধ্যে শিল্পীত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'শুধু কেরানি' গল্পটির রচনাশৈলির প্রথমেই পাখিদের খড়কুটো ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল দিয়ে সেগুলো নীড় বাধার কথা উল্লেখিত আছে। গল্পটির সেই বাক্য হল—

"তখন কালবৈশাখীর সমীকরণ আকাশে নীড় ভাঙ্গার মহোৎসব লেগেছে" ।

স্বামী কেরানি ও কেরানি পত্নী স্ত্রীর সুখের দাম্পত্য জীবনের সমাপরিভাষ্য এই নীড় ভাঙ্গা শব্দের মধ্যে উপস্থিত আছে। সুখের অনুভূতি ও ভালোবাসার অমেয় স্বাদ ও দম্পতির অন্তরে ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে স্ত্রী-র ভালো চিকিৎসা করাতে না পারাই স্বামী কেরানির অন্তরের যে রক্তক্ষরণ তা স্ত্রী-র করুণ হাসির মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে।

'বাঁশি' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রায়িত করেন হরিপদ কেরানির নজর জীবন সংগ্রাম পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানি কেরোসিনের পয়সা বাঁচানোর জন্য সন্ধ্যা কাটাই শেয়ালদা স্টেশনে, দত্তের বাড়িতে তাহার ছেলেকে পড়িয়ে আহার মিলে তাতে খাবারের পয়সা বাঁচে।

উপসংহার ঃ শুরুতেই আমরা দেখতে পাই লেখক কেরানীর সঙ্গে নারীজাতির তুলনা করেছেন। কেরানীর নিত্যদিনের কর্মজীবনের এই করুণ অবস্থা থেকে তার নারীসুলভ স্বভাবের কারণে

সে নিজেকে উদ্ধার করতে অ৭ম। সুতরাং তার সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকের এই উদ্ধার-কাজে পায় চাকরিপ্রার্থী আসতে হবে এটাই লেখকের অভিপ্রায়। বাঙালি কেরানীদের বিভিন্ন দাবি পেশ করার জন্য কোন সংগঠন নেই। তাই তার নারীর মতো স্বভাব। তাই "ভদ্রলোক" উদ্ধারকর্তা ছাড়া কেরানীর আর কোন উপায় নেই। কেরানীর শত প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও তার আর ভদ্রলোক হতে পারে না। কারন, কেরানীর পাশ করা সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা, ফলে কেরানীর বেতন ক্রমশ কমতে থাকে। চাহিদা আর জোগানের এই অসাম্যের জন্যই কেরানীর 'ভদ্রলোক'-সুলভ জীবন-যাপন করা ক্রমাগত কঠিন হয়ে পড়েছিল। লেখকের দুশ্চিন্তা হল এই যে জনশিক্ষার প্রকল্প কার্যকর হলে নীচু জাতের মানুষ শিক্ষিত হয়েও কেরানীর চাকরি করতে হবে। এর সহজ কারণ হল— কেরানীর চাকরির জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। কেরানীর "ভদ্রলোক" শ্রেণিভুক্ত হলে তার জাতিগত পরিচয় অনেকটা সাহায্য করত। তথাকথিত "সামান্য লোক" তখন "ভদ্রলোক" হয়ে উঠবে, আর কেরানীর ভদ্রলোকের শেষ সম্বলটুকুও থাকবে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা

মৌমিতা নন্দী

৬ষ্ঠ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

সাহিত্যরূপ হিসেবে ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছোটগল্প বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায় যা আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে এক নাগাড়ে পড়ে শেষ করা যাবে। তবে আকারে ছোট হলেই তাকে ছোটগল্প বলা যায় না। কারণ ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকতে হবে। অর্থাৎ অল্প কথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে হবে। উপন্যাসের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এখানে। ছোটগল্পে উপন্যাসের বিস্তার থাকে না, থাকে ভাবের ব্যাপকতা। উপন্যাস পড়ে পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু ছোটগল্প থেকে পায় কোনো ভাবের ইঙ্গিতমাত্র। ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন—

"ছোটো প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ।"·

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেখক। তাঁর জীবনকাল ১৯০৬–১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তাঁর কুড়িটি গল্প সংগ্রহে প্রায় দুশো বাইশটি গল্প সংকলন হয়েছে। প্রধানত তাঁর রচনায় মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, প্রতিবাদীচেতনা, সংগ্রাম ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ই জৈষ্ঠা, ১৯০৮ সালের ১৯ মে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে মানিকের জন্ম। আদি পৈত্রক নিবাস ছাকার, বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রামে। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার, জন্ম পত্রিকায় নাম ছিল অধরচন্দ্র। কিন্তু তার জৈষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সূত্রে জানা যায়, গেয়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখে তাঁর আতুড়েই নামকরণ হয়েছিল 'কালোমানিক' এবং সেই মানিক নামটাই রয়ে গেল আজীবন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে নির্বাচিত ছোটগল্পগুলি হলো – (১৯৩৫) সালে 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯৩৭) সালে 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৪৬) সালে 'মাসিপিসি' (১৯৪৮) সালে 'হারানের নাতজামাই' (১৯৪৯) সালে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রকাশিত হয়।

মানিকের প্রথম পর্বের গল্পে আছে ফ্রয়েডির চিন্তাধারার প্রভাব। সে যুগের অধিকাংশ লেখকের মধ্যেই তচা ছিল। মানিক পরে নিজেই এ প্রভাবকে সজ্ঞানে ত্যাগ করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী। মনোবিকলনের দ্বারা মানবজীবনের এক ভগ্নাংশকে আবিস্কার করা যায়, সমগ্র জীবনকে নয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনকে সামগ্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মনোবিকলন নয়, অর্থনীতি। স্বভাবতই মানিক এই চিন্তাকে বেশিদিন আঁকড়ে রাখতে পারেন নি। তাছাড়া মানিকের প্রথম পর্বের চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে পরস্পর বিরোধিতা, অস্বাভাবিকতা এবং যৌনতার প্রাধান্য। এবং পরের পর্বে তিনি মার্কসবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। তখন তিনি জীবনকে বিচার করেন সামগ্রিকভাবে। সেজন্য এ জীবনে তিনি যেমন দেখেন অবিচার, অত্যাচার, দাঙ্গা, খুনোখুনি অন্যদিকে তিনি উপলব্ধি করেন এগুলোই জীবনের পরম সত্য নয়। এখানেই মানিকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র।

"আত্মহত্যার অধিকার" এর নীলমনির জীবনযাপনের কোন ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই বর্তমান সামাজিক অবস্থায়। মৃত্যুর সঙ্গে, দারিদ্র ও অত্যাচারের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তাকে বাঁচতে হয়। এই গল্পের শুরু একটি বর্ষার রাত্রির পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নীলমনিকে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। শ্যামার চোখের দৃষ্টির মধ্যে অক্ষম পিতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ খুঁজে পায়নি নীলমনি। নীলমনি অসুস্থ স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে যখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলো, "বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ আর কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিস্প্রয়োজন"। তখন উপায় না দেখে বৃষ্টির মধ্যে সে বেরিয়ে পড়লো। তখন তার মনে হচ্ছিল—"জগতের কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যার গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়ে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে" (৩) সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায় ?

তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে : পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান সে কোনদিকে সামলাইবে ? নীলমনিদের স্বপক্ষে লেখক যেন সওয়াল

শুরু করেছেন ? — "যে সমাজ এদের বাঁচানোর দায় স্বীকার করেনি, সেই সমাজে এরা যদি নিজেদের দায়িত্বে আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে প্রাণহীন আইনের মাধ্যমে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার কী যৌক্তিকতা আছে ?"·

অন্নপূর্ণার ভান্ডারে নীলমনির উপবাসী থাকার চেয়ে, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবে কম দম আটকানোর চেয়ে আত্মহত্যার অধিকার কি অধিকতর কাম্য নয় ? সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নিম্নশ্রেণীর মানুষের অতিবাস্তব বলিষ্ঠ ক্ষেত্রে এ গল্পটি বাংলা সাহিত্য এক বিরল উদাহরণ।

"প্রাগৈতিহাসিক" মানিকের জনপ্রিয়তম গল্প। "অতসীমামি" গল্প মানিককে সাহিত্য জগতে স্বীকৃতি দিয়েছে আর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প তাঁকে করেছে রীতিমতো বিখ্যাত। এই গল্প এক চিরন্তন সত্য রূপ লাভ করেছে। এই গল্পের নায়ক এক নৃশংস ডাকাত। নাম ভিখু। ভিখুর দিন কাটছিলো হত্যা, লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। বৈকুণ্ঠ সাহার গতিতে ডাকাতি করতে গিয়ে বর্ষার খোঁচ খেয়ে একমাত্র সেই পালাতে পেরেছিলো। প্রথমে বনের মধ্যে পরে বন্ধু পেহ্লাদ বাগতির বাড়িতে গুপ্তভাবে আশ্রয় পেয়ে এক রকম বিনা যত্নে ও চিকিৎসায় ভিখু সেরে উঠল। কাঁধে বর্ষার আঘাতের ফলে ডান হাতখানা গাছের মরা ডালের মতো শুকিয়ে গিয়ে অবশ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই ডাকাতি করবার উপায় আর নেই। একদিন পেহ্লাদের স্ত্রী হাত ধরার জন্য ভিখুকে মারের চোটে আধমরা করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। প্রতিহিংসায় পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়ে সে পালিয়ে এলো মহকুমা শহরে। শুরু হল তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। তখন সে ভিক্ষাজীবি। পার্শ্ববর্তিনী ভিখারিনী পাঁচির পায়ের দগদগে ঘা সত্ত্বেও ভিখু তার আসঙ্গ কামনা করে। ভিখু সাগ্রহে পাঁচিকে বলে—

জানস ? আমি তোরে রাখুম।

তখন পাঁচি বলে 'আমি থকেলি ত'·

ভিখু আবার বলে ক্যান ? থাকবি না কান ? খাওয়ামু, পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পর নি পা-টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস তুই কিয়ের লেগে ?· পাঁচির আশ্রয়দাতা বসির মিয়াকে হত্যা করে ভিখু তার আজন্মসঞ্চিত গোপন অর্থের পুঁজি এবং পাঁচিকে নিয়ে কালোরাত্রির ক্ষীণ চাঁদের আলোয় নতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ভিখু পাঁচিকে পিঠে নিয়ে চলতে লাগল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃস্বাড়ে পড়ে আছে। "দূরে গ্রামে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচি পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং যে অন্ধকারে তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।"·

"হারানের নাতজামাই" নামক ছোটগল্পে ময়নার মা মানিকের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কৃষক আন্দোলনের প্রিয় নেতা ভুবনকে পুলিশ খোঁজ করতে গিয়ে কিভাবে এক সরল গ্রাম্য রমণীর কাছে বোকা বনে যায়। ভুবন পুলিশকে সামাল দেওয়ার কথা বললে। তখন ময়নার মা বলে "থামেন আপনে, বসেন, দেখেন কি হয়।"·

ময়নার মা ভুবনকে জামাই সাজিয়ে মেয়ের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। আসল জামাই জনমোহন আসে

এবং বিব্রত শাশুড়ির সামনে তার মেয়ের সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু অত্যাচারী পুলিশের মুখোমুখি হলে এহেন জগমোহনের শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয়। এবং পরিণামে তাকে শোচনীয়ভাবে আহত হতে হয় নিরক্ষর ও দারিদ্র মানুষের মূল্যবোধ যে কতটা জাগ্রত তা "হারানের নাতজামাই" গল্পে স্পষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মাসিপিসি" গল্পে স্বামীর নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন তরুনীর করুণ জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত। আহ্লাদি নামের ওই তরুনীর মাসি ও পিসি দুজনেই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ পরিবেশ থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য সবসময় তটস্থ থাকে। একসময় জমিদার কত্তাবাবুর নজর পড়েছিল আহ্লাদির ওপর। তিনি আহ্লাদিকে ধরে আনবার জন্য একদিকে পাঠালেন চৌকিদার কনস্টেবল অন্যদিকে গুন্ডা। বটি আর দা হাতে তেড়ে আসে মাসিপিসি। তখন তারা ভয়ে পালায়। কিন্তু মাসিপিসি জান এখানেই শেষ নয় ওরা আবারঘুরে আসতে পারে।"মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।"

অতএব ভাবি যুদ্ধের আশঙ্কায় তৈরী হয়ে থাকে মাসিপিসি। তাদের বুদ্ধি এবং সাহসী সংগ্রাম গল্পটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" গল্পটি তার এক অসাধারণ সৃষ্টি। এটি স্বাধীনতা উত্তরকালীন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত ফসল। ১৯৪৮–৪৯ সালে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্রক রে কৃষকদের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। শুরু হয় গ্রামে-গঞ্জে অবর্ণনীয় পুলিশী সন্ত্রাস এবং তার সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী প্রশাসনিক সহযোগিতায় রাজনৈতিক দল তাদের কাজ শুরু করে। এই ধরনের দমন-পীড়ন-নির্যাতিত কৃষক অধ্যুষিত কমলাপুর চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শোষকশ্রেণীর অত্যাচারের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, মূলত তাকেই কেন্দ্র করে লেখক "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" গল্পটি প্রকাশ করেন। দিবাকর ও আন্না বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নর-নারীর প্রতিনিধি যারা অসহায়, তারা নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়। সমগ্র পরিস্থিতি ও পরিপার্শ্ব বর্ণনায় মানিক অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের অনাহারী মানুষের অসহায় দুর্দশার চিত্র বাংলা সাহিত্যে অনেকেই রচনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তিনি কেবল দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা মুখ বুজে অসহায় অবস্থাকে স্বীকার করেনি, প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে। লুঠ করে জেল খেটেছে। মানিক তাদের সজীব এবং প্রতিবাদী মানুষ করে গড়ে তুলে এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। মানিকের সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর ভালোবাসা। মন্বন্তরের সময় মানিক বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী দরিদ্রদের না খেয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসে অতি দুঃখে বলেছিলেন— "দুশো বছরের পরাধীনতায় বাংলার মেরুদণ্ড গেছে ভেঙ্গে। গরিবগুলোকে কত বললাম— না খেয়ে শেয়াল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারদের তালাবন্ধ গুদামগুলো লুঠ করে একদিনও পেট পুরে খেয়ে বাঁচি— তারপর না হয় জেল খাটবি। কিন্তু ব্যাটাদের কি সে সাহস আছে।"-

যুদ্ধের হতাশায় এবং বিশৃঙ্খলায় যখন মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল তখন

মানিকই দেখতে পেলেন সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যেই বিবেক, প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিত্র। মানিক সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে খুঁজে পেলেন অসাধারণ সব মানুষের জীবন সংগ্রামের সুস্পষ্টতা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে মানুষের মধ্যেকার ভালো-মন্দ বিশেষত্বগুলো খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে এবং সকলের উপর তিনি খুঁজে পেলেন এমন সব বিশেষত্ব যেগুলো নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে কিছু লেখা হয়নি এবং যেগুলো অনুশীলন করে তিনি নিত্য নতুন সৃষ্টির কাজে প্রেরণা পেলেন।

মানিকের গল্পে ঋতুবৈচিত্রের কোন উল্লাস নেই, পাহাড়-সমুদ্র বা অন্য কোন নিঃসর্গচিত্রের জন্য নেই কোন ব্যঞ্জনাময় উচ্ছ্বাস। তাঁর গল্পে চাঁদ ওঠে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক উদাসীন সম্পর্কের তির্যক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, তাঁর গল্পে অনেকবার বৃষ্টি ঝরে পড়ে দুঃখী মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রাকে দুঃসহতর করে তোলার অনিবার্য প্রয়োজনে।

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বনিকের পালা' : পুরাণের নবীকরণ

মৌমিতা দাস

৬ষ্ঠ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

'পুরাণ' শব্দের অর্থ হল প্রাচীন কথা, অর্থাৎ যেখানে প্রাচীন কথা বর্ণিত হয়েছে তাই পুরাণ পুরাকালের সৃষ্টি ধর্ম, আচার ধর্ম, প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার সংকলনকে সাধারণ ভাষায় পুরাণ বলে। নবীকরণ : পুনরায় আবার নবরূপে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া, এক কথায় 'পুরাণের নবীকরণ'-এর অর্থ হল প্রাচীন কথাকে নতুনভাবে বা নবরূপে রূপান্তরিত করা।

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিস্তার। মঙ্গলকাব্যে দেবী চণ্ডী, দেবীমনা ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা গড়ে উঠেছে মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগণরা হলেন কানা হরিদত্ত ১৪৮৪ শকাব্দে পদ্মপুরাণ রচনা করেন। বিপ্রদাস পিপলাই হলেন মনসামঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম কবি তাঁর কাব্যের নাম— 'মনসাবিজয়'। অনেক কবি মনসামঙ্গল লিখেছিলেন তাঁহারা হলেন বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন স্থানের লোক। বিপ্রদাস মনসাপাঞ্চালীর সবচেয়ে পুরনো কবি। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যে রয়েছে।

এইজন্য বিপ্রদাসের কাহিনীকে অনুসরণ করে মনসাকাহিনী পল্লীগীতিকা বা ছড়ার আকারে সংক্ষিপ্ততম মূলকাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। ১৪১৭ কাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫–৯৬ অব্দে বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পালাটিকে ত্রয়োজশ পালাতে ভাগ করে কাহিনীটি রচিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চম পালার শেষ অংশ থেকে চম্পক নকরের বণিক চাঁদ সওদাগরের চরিত্রটি বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ত্রয়োদশ পালায় সমাপ্ত হয়েছে, মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগর ছিলেন চম্পক নগরের বণিক। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ, আত্মশক্তিতে অবিচল বিশ্বাসী মহাজ্ঞানী দেবতা শিবের ভক্ত। মনসামঙ্গলে মনসাদেবীকে

বণিক চাঁদ সওদাগর পূজো না করলে পৃথিবীতে তাঁর পূজা প্রচার হবে না।

তাই চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে মনসাদেবী পূজো নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চাঁদ সওদাগর শিব ভক্ত তিনি তার পূজা ছাড়া আর কোন দেবদেবীর পূজা করতে রাজি হয়নি। স্ত্রী সনকা মনসা দেবীর পূজা করেন। চাঁদ সওদাগর তা জানতে পেরে লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙ্গে দিলেন। মনসা দেবী ক্রোধান্বিত হলে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেল। মনসার পূজো করলে মৃত পুত্ররা প্রাণ ফিরে পাবে বলে প্রলোভন দেখালেন চাঁদ সওদাগরকে, তারপর চাঁদ সওদাগরের লাঠির আঘাতে মনসা দেবীর পাঁজর ভেঙ্গে যায়। আবার সনকা গোপনে মনসার কাছে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করলে মনসা তাকে পুত্রবর দেন।

এদিকে অবিচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা চাঁদ সওদার চৌদ্দডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্যযাত্রায় যাচ্ছেন। মনসা আবার চাঁদকে পূজা করতে নির্দেশ দেন কিন্তু তারপর চাঁদ সদাগর বাণিজ্যবহর নিয়ে পাটনে পৌঁছালেন এবং নিজের তুচ্ছ দ্রব্যসামগ্রিক বিনিময়ে বহুমূল্যবান সম্পদ লাভ করেছিলেন। ফেরার পথে মনসা আবার পূজো করতে চাঁদ সওদাগরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে চাঁদ সওদাগর তাকে অপমান করে তাড়ালেন। সে শিব ভক্ত চাঁদ আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। মনসা রাগে সমুদ্রে অসময়ে ঝড় তুফান তুলে চাঁদ সওদাগরের সমুদয় বাণিজ্যবহর ডুবিয়ে দিলেন। চাঁদ বহুকষ্টে তীরে উঠলেন। বারো বৎসর নানা দুঋখ কষ্ট সহ্য করে চাঁদ ভিক্ষুকের বেশে নিজের দেশে ফিরে এলেন।

আবার এদিকে মনসার বরে সনকার পুত্র লাভ হয়েছে পুত্রের নাম লখীন্দর বা লকাই। চাঁদ সওদাগর নিঃস্ব হয়ে ফিরলেও পুত্রে মুখ দেখে সকল দুঃখ ভুলে গেলেন। সনকার অসম্মতি উপেক্ষা করে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ নিলেন উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা পরমাসুন্দরী বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিয়ে দিলেন। মনসার কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার ঘর তৈরি করানো হল। কিন্তু দৈবাৎ চিলের মতো সরু একটি ছিদ্র রয়ে গেল আর সেই ছিদ্র দিয়ে লখিন্দর আর বেহুলার বিভা-রাত্রে এক সাপ এসে দংশন করলে সে মারা যায়।

এরপর সর্পদংশনে মৃত লখীন্দরের দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল আর তাকে বেহুলা মৃত স্বামীর অনুগামীনী হয়ে মৃতদেহের সঙ্গে ভেলায় ভেসে চলল। স্বর্গলোকে দেবতাদের কাছ থেকে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে, তাই নদীপথে বহুবাধার সম্মুখীন হয়েও বেহুলা নিরাশ হয়নি। সমস্ত বাধা-বিপত্তি জয় করে সে এগিয়ে চলল। ভেলা স্বর্গের ধৌপী নেতার ঘাটে পৌঁছালো। নেতা একটি ছেলেকে নিয়ে কাপড় কাচছিল। ছেলেটিকে দুরন্তপনায় বিরক্ত হয়ে নেতা তাকে আঘাত দিয়ে মেরে ফেলে রেখে যাবার সময় তাকে মন্ত্র পড়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। বেহুলা এই দৃশ্য দেখে নেতাকে অনুরোধ করল। নেতা নিজের অক্ষমতার কতা বলে বেহুলাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গেলে সেখানে নৃত্যগীত দেবতাদের তুষ্ট করে বেহুলা তাদের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। শিবের নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন তবে বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে চাঁদ সওদাগরকে পূজো করতে হবে, বেহুলাসম্মত হয়ে মনসার দয়ায় ছয় ভাসুর ও শ্বশুরের চোদ্দ'শ ডিঙা বাণিজ্যবহর সবই নিয়ে ফিরে এলেন।

বেহুলা ধনরত্ন পূর্ণ চোদ্দ ডিঙা নিয়ে চাঁদের সাত পুত্র সহ ঘাটে এসে ভিড়লো। চাঁদ সওদাগর ছুটে এলেন, কিন্তু এরপর বেহুলার কথায় মনসার পূজো করতে সম্মত হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে

একটি ফুল মনসার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন। মনসা তাতেই খুশি আর এভাবেই পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হল। তারপর স্বর্গলোকে ফেরার পথে লখীন্দর আর বেহুলাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

'চাঁদ বণিকের পালা' আধুনিক রূপান্তর : মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসামঙ্গলের কবিরা দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের সর্বাধিক মনোযোগী ছিলেন। দেবী মনসার প্রতি ভক্তি নিবেদন জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা এই বাণী মনসামঙ্গল কাব্যে উচ্চারিত।

স্বাভাবিকভাবেই দেবমহিমা যে কাব্যের মূল অবলম্বন এবং দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের যে কবির মুখ্যকর্ম– সেক্ষেত্রে অন্য ঘটনা ও অন্য চরিত্র তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। সে কথা বলাই বাহুল্য মধ্যযুগের যুগরুচি ও পরিবেশ এমন এক জৈব মহিমাযুক্ত কাব্য রচনা অনুকূল ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথিতযশা নাট্যশিল্পীকার পরিচালক যখন মধ্যযুগের সেই কাহিনীকে অবলম্বন করে তখন আমাদের মধ্যেই উৎসব জাগে আমরা অনুকূল আগ্রহে লক্ষ্য করতে চাই যে শম্ভু মিত্রের মতন আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব আধুনিক সমাজে মনসামঙ্গলের কাহিনীকে কিভাবে রূপদান করেন।

আমরা পূর্বেই এ কথা বলেছি যে শম্ভু মিত্র তার 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক রচনায় মনসামঙ্গলকে অবলম্বন করলেও মূলত তিনি মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর চরিত্রে যেটুকু লড়াই আপোষহীন মনোভঙ্গিমা, আপন আদর্শ অটল থাকার ইচ্ছা লক্ষ্য করেছিলেন তাকেই আধুনিক সমাজে একজন সত্যনিষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রিয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাপতিত করতে চেয়েছেন। মনসামঙ্গলের কবিকাম চাঁদ সওদাগরের পতনের জন্য যেখানে মনসার প্রতি তার আনুগত্যহীনতা, জিদ, অহংকার ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদ বণিকের পালা নাটকে চাঁদ সওদাগরের পতনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরোচার ব্যক্তি স্বাধীনতাপ্রিয় আদর্শবান চাঁদ বণিকের আপোষহীন মনোভঙ্গিমাকে দায়ী করেছেন।

তাছাড়া, 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিভোর নাট্যকার। যে সমাজ গণতন্ত্রের কোন মূল্য নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্বীকৃতি নেই, সেই স্থবির সমাজকে ভাঙতে ও নতুন করে গড়তে চেয়েছেন শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিক।

এখানে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

'ভাইরে আমরা কী সেই নিভারিয়া বাপ-পিতামহের বংশের সন্তান ? প্রাণ দিয়া তারা নিজ প্রাণ টারে সওদা করেছে আর আমরা কী করি ? এই চম্পক নগরীর যত নিভারিয়া সওদাগর ভাই সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ, আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য, আমাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারে না।'

চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, আরাধ্য শিব ছাড়া মনসাকে পূজো করার অটল ঘোষণা যেখানে মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে নিছকই মুখ্যমি ও গোঁয়ার্তুমি, —সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদের এই আচরণকে বস্তুত একজন আদর্শবাদী আত্মবিশ্বাসী মানুষের সত্যনিষ্ঠা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে আপোষকামিতায় জীবন কাটানো তো অত্যন্ত সহজকর্ম। কিন্তু তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে চাঁদ বণিকের উচ্চারণ যেন আধুনিককালের আদর্শবাদী ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের ঘোষণা।

'জানি এইসব খুব ধানচাল বেচনের পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা— কিন্তুক ভাইসব, এই যে চম্পকনগরী, এরে যারা আদিকালে সৃষ্টি করেছিল, আমাদের সেই বাপ-পিতামহদের দল তারা কি কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়ে এদেশের মর্যাদা গড়েছে ? এই রক্তমত্তি হতে দূর সুপ্পারকে গেছে।'

এখানে লক্ষ্যণীয় 'দেশ' শব্দটি মনসাঙ্গলের দেশ বা দেশের ভাবনা দেবী মনসার পূজার মধ্যে সমাহিত। আধুনিক সময়ের অর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সংকটকে শম্ভু মিত্রের নাটকে চরিত্র হিসেবে অনুপস্থিত। কেননা আধুনিক প্রতিষ্ঠানিক শক্তি নেপথ্যে থেকে তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আপন কর্তৃক কায়েম রেখে, সেজন্য বেণীনন্দন যা আচার্য বল্লভ নানাভাবে চাঁদ বণিকের কায়েম রেখে, সেজন্য বেণীনন্দন বা আচার্য বল্লভ নানাভাবে চাঁদ বণিকের বাণিজ্য যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে, চাঁদ বণিকের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা ঘৃণা ষড়যন্ত্র।

বল্লভ ও চন্দ্রধর সম্পর্কে তোমার মনগত অভিপ্রায় কী ?

বনমালী। আমার তো ব্যক্তিগত কোনো অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয়, প্রভু অভিপ্রিয় শাসনবিধির সে বিধির কাজ হোল, সমাজের যে আকার আছে তার এক নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে পরিপাটি করে রাখা, এই নিয়মভঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা কখনো তো কোনো সমাজেই প্রশ্রয় পেতে পারে নাকো।

আলোচ্য নাটকে চাঁদের শিক্ষাগুরু আচার্য বল্লভের সময়ের স্রোতে মানসিক পরিবর্তনটুকু একান্তভাবে লক্ষণীয়।

'অর্থহীন জীবনের এই কালিদহে শুধু যেন ঘৃণাচক্রে ঘোরে, সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, চারা বলো, সব যেন বুদ্‌বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়, সত্য শুধু অন্ধকার, মনসার সর্পিলো আন্ধার।'

আচার্য বল্লভের এই উচ্চারণে যে অনন্যোপায় আত্মসমর্পণ তাই শুধু নয়, চাঁদ বণিকের সিক্ষাগুরুর এই আপোষ চাঁদ বণিকের লড়াইকে আরো কঠিন করে তোলে। শুধু তাই নয় চাঁদ বণিকের সহধর্মিনী স্ত্রী সনকা ও আদর্শগতভাবে চাঁদ বণিকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সনকাকে মনসাঙ্গলের ঘর টোপের বাইরে টেনে এনেছেন শম্ভু মিত্র।

তাই 'মেঘনাদ বধ' এর কাব্যের 'চিত্রাঙ্গদার' মতো সনকা আপন সংসারে মঙ্গলার্থে যা খুশি বলতে পারো তা করতে পারো।

'সওদাগর তুমি ভালো করে বিবেচনা করো জীবনের সব অর্থ গণনায় কেই পাওয়া যায় ? দিন মানে সে আলোক দেখি সেইট্যাতো জীবনের একমাত্র সত্য নয়'।

আবার লখিন্দর আধুনিক সময়ের যুবকের মতোই পিতাকে প্রথমদিকে অভিযুক্ত করেছে তীক্ষ্ণভাবে।

'কেন তুমি এই পথ বেছ্যে নিয়াছিলে ? ঘর পেলে ? শান্তি পেলে ? সমাজে সম্মান পেলে ? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয় ?'

বাস্তবে চাঁদের এই সংকট এহেন সর্বব্যপ্ত প্রতিপক্ষ যার সামনে মনসার প্রতিনিধি আধুনিক সময়ে, এহেন সংকটে চাঁদের পাশে দাঁড়াবার মতোন কেউ নেই। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের কাহিনী এখানে নিছক চাঁদের সংকটের কাহিনী নয়, স্বতন্ত্র চম্পক নগরীর কাহিনী মাত্র নয়, আধুনিক সময়ে ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্যের সংকটরূপে চিহ্নিত, আধুনিক স্বার্থমগ্ন জীবনের কুটিল রাজনীতি পুরাণের আবহ অতিক্রম করে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় মিলে যেতে চায়।

এ নাটকে লোকপুরাণ কথার শেষাংশ ছাড়া অন্যত্র শম্ভু মিত্র প্রচলিত কাহিনীর কোন মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাননি।

মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত এবং পরিণামে চাঁদের পুরাভাবে ও নতি স্বীকার মিথের এই কাঠামোটুকু এই 'পালা'তে অক্ষুন্ন রয়েছে বিফল অভিযান মৃত সব সহযাত্রীদের ছায়ামূর্তিরা অলক্ষ্যে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে তাঁর কাছে অজস্র, অজস্র এক চিরবিদ্রোহীর মতো চাঁদ পাড়ি দেন সেই স্মৃতি নতুন প্রত্যাশার খোঁজে মহাকালের সমুদ্রের বুকে।

লখীন্দর ও বেহুলার প্রতি বাৎসল্য ও স্নেহের কারণে চাঁদ হার স্বীকার করেন মনসাকে পূজা দেবার পরেও যে নিরূপায় হয়ে তাদেরকে আত্মহনন করতে হয়—প্রতিষ্ঠিত মিথ কথার বিরোধী সেই ঘটনা নিদারুণ আঘাতে চাঁদের ট্র্যাজেডি বিকীর্ণ হয় এক অসীম মাত্রায় শিবাই রূপা সত্যকে খুঁজতে গিয়ে তিনি তাকে পাননি। তাঁর উত্তর পুরুষরাও আর তা পাবে না তো, সর্বৈব একটা রিক্ততায় ভিখারী হয়ে গেলেও কিন্তু চাঁদ সত্যের সন্ধান পরিত্যাগ করেন না। নাটকের শেষ মুহূর্তে তাই আবার তাঁর পাড়ি দেওয়া সেই 'সত্য'র খোঁজই।

মিথে বেহুলা লখীন্দরের মিলন ঘটেছে শান্তি এবং সুখের মধ্যে। মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাদের প্রেম বিজয়ী হয়ে ফিরেছে। শম্ভু মিত্রের নাটকে তাদের মিলন কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেই অপচয়িত, বিধবস্ত যৌবন শক্তির এই মর্মান্তিক পরিণতি মিথের বিবরণকে পাল্টে দিয়ে ট্র্যাজিক এক বেদনায় রূপান্তরিত করেছে।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব

শ্যামলী সিংহ

৪র্থ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

ভূমিকা ঃ

"চক্ষু থাকিতে অন্ধ যারা আলোকের দুনিয়ায়
সিধু সোটয়া বিষ পায় তারা অমৃত নাহি পায়।"

এরূপ অন্ধত্ব মোচনে শিক্ষার বিকল্প নেই। যেহেতু নারী ও পুরুষ সমাজ দেহের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেহেতু সমাজ গঠনে উভয়েরই ক্ষেত্রে কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে। আর এ দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যা তাদের জীবন ও কর্মধারার সাথে সম্পৃক্ত।

এদেশে নারীর অবস্থা ঃ আমাদের সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে নর-নারী উভয়কে সমান চোখে দেখা হত না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের শিক্ষার সুযোগ ও মানসিকতা যতটুকু ছিল নারীদের জন্য ছিল ততটুকু ছিল না। ফলে একই পরিবারে ছেলের শিক্ষার সুযোগ থাকলেও নারীদের তেমন সুযোগ দেওয়া

হত না। এই অভিশাপ আমাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে নানান সমস্যা। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের অগ্রগতি ব্যাহত হতো। কিন্তু, বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে নারীরাও পুরুষদের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি সফলতা অর্জন করছে। শিক্ষার সুব্যবস্থার উন্নতির ফলে নারীরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হচ্ছে। বর্তমানে পরিবারগুলিতে ছেলেমেয়েকে সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে। ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনোরকম ভেদাভেদ করা হচ্ছে না।

প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে দেখা যায়, পাসের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকে। স্কুল-কলেজে এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি। এতে সহজেই বোঝা যায়, বার্তমানে বাংলার নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নত দেশের নারী ঃ উন্নত দেশে নারীদের অবস্থান আজ সুদৃঢ়। এর প্রধান কারম হল তারা তাদের দেশের নারীদের শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ তারা করেনি। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশের নারীরা সকল ক্ষেত্রে পাদর্শী। এসব দেশের নারীরা আজ আর পুরুষদের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ নারী শিক্ষার গুরুত্ব আজ কোনো সন্দেহ নেই। নারীরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। তাই এ নারীদের অশিক্ষার অধিকারে রেখে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে পারি—

"রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন,
রাজারে শাসিছে রানি।
রানির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।"

তাই জাতিকে উন্নত করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সমানভাবে শিক্ষিত করতে হবে। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীরা আজ ঘরে-বাইরে দুই দিক সামলাচ্ছে। পুরুষদের সাথে নারী কল-কারখানায়, মাঠে কাজ করছে। নারীরা এখন প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। তাই নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

শিক্ষিত জননী হিসেবে নারী ঃ একন সুশিক্ষিত মা জন্ম দিতে পারেন একজন সুশিক্ষিত সন্তান। তাকে গড়ে তুলতেপারেন নিজের আদর্শে আদর্শিত। কারণ, একটি সন্তান এর উপর মায়ের প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। মায়ের কাছ থেকে আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নেপোলিয়ন বলেছিলেন—

"আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তেমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।"

স্বাবলম্বিতা অর্জনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ স্বাবলম্বিতা অর্জনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকালে নারীরা সমস্ত কিছুর জন্য তাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল অবহেলিতা ও নির্যাতিতা। গৃহের মধ্যেই তারা অবাধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নারীরা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিকা, পুলিশ-বৈমানিক ইত্যাদি এমনকি সম্প্রতি নারীরা সেনাবাহিনীতেও বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। তারা আজ সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বি। আজ আর নারীকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

দেশ গঠনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ঃ দেশ গঠনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অতীতে দেশ গঠনে নারীদের যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। বর্তমানেও দেশ গটনে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে এ পর্যন্ত যত আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেকটি আন্দোলনে নারীদের কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। আর এ অবদান রেখেছে শুধুমাত্র শিক্ষিত নারীরা। তাই দেশগঠনে নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষিত নারীদের সফলতার দৃষ্টান্ত ঃ যুগে যুগে শিক্ষিত নারীরা তাদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীতে অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের নারীরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আন্তর্জাতিক, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিভা পাতিল, ইন্দিরা গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মার্গারেট থ্যাচার প্রমুখ তাদের শিক্ষা ও মেধা দ্বারা মহিলা হয়েও বিশ্বব্যাপী পরিচিত। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যেমন– সাহিত্য ক্ষেত্রে কামাল, জাহানারা ইমাম প্রমুখ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনা ওয়াজেদ যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নারী শিক্ষার অন্তরায় ঃ নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। এছাড়া নারী শিক্ষার একটি বিশেষ বাধা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব। নিরাপত্তার অভাবের জন্য কোনো অভিভাবকই তাদের কন্যা সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চাননা। এর সাথে আছে চরম দারিদ্রতা। আমাদের দেশে দারিদ্রতার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাত থেকে জনগণকে মুক্ত করতে না পারলে শুধু শিক্ষাই নয় দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থতা দেখা যাবে। সর্বোপরি, দেশের বিপুল সংখ্যক নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক জগৎ-এ নিয়ে আসার জন্য যে বিশাল উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো প্রয়োজন তা আমাদের নেই।

নারী শিক্ষার বিস্তারের উপায় ঃ নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। যেমন– দেশের নারী শিক্ষার্থীর অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ, বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নারী শিক্ষা প্রচারের জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলী ঃ বর্তমান সরকার নারীবান্ধব সরকার। নারীসমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে বর্তমানে সরকার নানান কর্মসূচি করছে। নারী শিক্ষার বিস্তারে বর্তমানে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলী অনেকটা প্রশংসনীয়। নারী শিক্ষার প্রসারে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্য বয়স্ক নারী শিক্ষা কেন্দ্রচালু করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি মহলও নারী শিক্ষা প্রসারে নানানভাবে অবদান রাখছে।

উপসংহার ঃ

'কোনো কালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারি

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে
বিজয় লক্ষ্মী নারী।'

সুতরাং, নারীকে পশ্চাতে রেখে উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। তাই নারীদের শিক্ষিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। দেশের উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা হল নারীমুক্তির পথ।

তোমার সহিত সাক্ষাৎ

রাহুল কুমার সাহু

মানুষের জীবনে একবার হলেও কাউকে না কাউকে ভালোবাসে সেটা থপঙশতগঙ। আর প্রথম সেটা তো মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মনে থেকে যাই চাইলেও কিছুতেই ভোলা যায় না। সেই মানুষটিকে সারা জীবনের প্রথমবার নিজের চেয়ে ও অন্যের প্রতি অসীম ভালোবাসা জন্মায়। প্রথম ভালোবাসা মানুষটি সঙ্গে দেখা করা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়।

তাই আমাদের আজকের গল্পটা ও প্রথম ভালোবাসার মানুষটি সঙ্গে দেখা করা নিয়ে, গল্পের নাম হল তোমার সহিত সাক্ষাৎ।

আমার এই গল্পেরসেই প্রথম ভালোবাসা মানুষটির নাম হলো রশ্মিকা। মাসটি ছিল জানুয়ারি রশ্মিকা সাথে আমারপ্রথম অফিসিয়ার ডেট ছিল। সম্ভবত আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি সুদর্শন দেখতে চেয়েছিলাম। এটা আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার দিন ছিল। আমি সে দিন আধঘন্টা আয়নার সামনে কাটিয়েছি। যাতে সব সম্ভাব্য উপায়ে নিখুঁত হতে পারি। আমি প্রায় ২০ বার চুল আঁচড়ালাম এবং তার জন্য অপেক্ষা করছি, হয়ত এটাই ভালোবাসার লক্ষণ, তার কথা ভাবলে মুখে হাসি ফুটে উঠত, নিজের সাথে কথা বলার মত অভ্যাস যেমন বার বার তার ম্যাসেজ পড়া আমার নিজের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ব্যাখ্যা করা প্রতি ২ মিনিট অন্তর ফোন চেক করা। তার সাথে সমস্ত কথোপকথন স্মরণ করা ঘন্টার পর ঘন্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রেম একটি নীরবতা নয়, কখনও কখনও আপনাকে কিছু জিনিস মেনে নিতে হয় যা ব্যাখ্যা করা যায় না আমি জানতাম আমি প্রেমে পড়েছি ইচ্ছাকৃত কিছু করছি না, আমার তার প্রতি সে ভালোবাসা সমস্ত নির্দোষ এবং নির্বোধ কাজ করতে বাধ্য করেছিল। হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠল, আমি প্রস্তুত ছিলাম এবং প্রস্থান করতে যাচ্ছিলাম, যখন আমি তাকে দেখলাম মিষ্টি হাসি সুন্দর কাজল দেওয়া চোখ আাকে কিছুক্ষণের জন্য নীরব করে দিল। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এটি তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল।কিন্তু আাকে পাগল করার জন্য যথেষ্ট ছিল এমন কিছু বলেন নি।

তিনি বললেন প্রস্থানে করিতে পারি ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি আমাকে বাইকের পেছনে বসালেন এবং আমরা রওনা দিলাম, সে মুহূর্তে তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমার সারা শরীর একটা বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হল, কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমরা

একটি পার্কে প্রবেশ করলাম, আমি যেমন নার্ভাস ছিলাম তেমনি খুব উত্তেজিত ছিলাম। আমি কিছু বলতে পারছিলাম না এবং ক্রমাগত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি তার বন্ধুদের সম্পর্কে বিভিন্ন জিনিস বর্ণনা করছিলেন এবং আমি একমত হয়ে মাথা নাড়ছিলাম, আমরা দু'জনেই দু'জনের হাত ধরেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমি অন্য কিছু চেয়ে তার চোখে হারিয়ে গিয়েছিলাম, আমি জানতাম তিনি আইসক্রিম খেতে পছন্দ করেন তাই আমি আইসক্রিম এর প্যাকেট ছিঁড়ে দিলাম এবং তিনি সেটি মৃদু হেসে গ্রহণ করলেন। তিনি এই সাক্ষাৎকে মনে রাখার জন্য একটি সুন্দর রিং উপহার দিলেন। কিছু সময় কাটানোর পর তিনি বললেন, "এবার আমরা রওনা হই" কিন্তু আমার মন মানছিল না। আমি নকল হাসি দিয়ে বললুম, "চলুন"। তাকে ঘরের কাছে ছেড়ে আমি যখন আমার ঘরের দিকে রওনা হচ্ছিলাম রশ্মিকা বলল, "এই দিনটি আমার জীবনে খুবই আনন্দের দিন ছিল, অন্য কোনো দিন আমরা এর থেকেও ভালো সময় কাটাবো।"

মেয়েটির স্বপ্ন

খুকু পাল

আজ থেকে কয়েক বছর আগে একটা ছোটো গ্রামে একটা ছোট্ট পরিবারে একটা ছোট্ট মেয়ের জন্ম হয়, নামটা তার জানেন কি ? যে- কোন একটা দিয়ে দিলেই হয়, শ্যামা, সুষমা, শ্যামলা, বা কমলা, কারণ নামের সাথে তার কোন বাস্তবিকতা নেই।

ছোটো থেকেই সে ছিল খুবই ভাবুক। প্রকৃতির কোলা মেলা পরিবেশের সাথে সে বড়ো হয়েছে। কিছু একটাতো নানা ধরণের কথা ভাবতো। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া 'বাবা বললেন দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হলে একটা ভালো দামী জামা এনে দেবো'। দ্বিতীয় শ্রেণিতেও সেইরকম আর একট নতুন কিছু পাওয়ার আশায় তার দিন চলে যায়। পড়াশোনার সাথে সে যখন খেলায় প্রথম হয় তখন সে তার প্রথম স্বপ্ন দেখে– সে নাকি অনেক বড়ো খেলোয়াড় হবে। আবারযখন সমাজে ভুল কিছু দেখে তখন সে ভাবে 'আমি খুব বড়ো এক অফিসার হবো' যাতে সবকিছু ভুলভাল সমস্যা ভাঙে সুন্দর সমাজ গড়বো। এইভাবে চলতে থাকে তার দিন।

যেহেতু সে ছোটো ছিল তাই সে জানতো না সামনে আসা কঠোর দিনগুলিকে সে এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে সমাজ সময় পরিস্থিতির সামনে লড়াই করতে হবে, লড়াই করতে হবে তাকে নিজেকে নিজের সাথে, মানিয়ে নিতে হবে সবকিছু।

তার সমস্ত ভুল ধারণা ভেঙে গেল তখন যখন সে তার পরিচিত সবকিছু ছেড়ে স্কুল থেকে কলেজে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল সবকিছুই–পরিচিত শিক্ষক শিক্ষিকা, বন্ধু বান্ধব, জায়গা। এমনকি বদলে গিয়েছিল তার দেখা সেই স্বপ্ন—বুঝলেন নাতো বলছি ...

তার নাকি একটা Subject খুব ভালো লাগতো সে নাকি ওই Subject এর ওপর Ph.D. করতে চেয়েছিল কারণ মনের মধ্যে ওঠা নামা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চায় সে। কিন্তু বদলে গেল সবকিছুই। রাত্রিতে

অনেক কেঁদেছে। সকালে উঠেছে হাসি মুখ নিয়ে কারণ চোখের জলের অনেক কারণ বললেই হয়তো কেউ বুঝবে না, বুঝলেও এদের বাধ্য হতে হয়, না বুঝে থাকার রাতগুলি যেন হয় অমাবস্যার কালরাত্রি।

এইভাবে সে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়– স্বপ্ন পূরণের জন্য নয়, হয় ভয়ে যাতে অন্য বান্ধীবেদর মতো তাকেও বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাতে না হয়। প্রথম থেকেই তার স্বপ্নগুলো যেন শহরের রাস্তায় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানোর জন্য Google Map-এ একটা Way পরিবর্তন করে আরেকটা Way root ধরে, তেমনভাবে জীবনে একটা স্বপ্ন মুছে গিয়ে আরেকটা আসে। লড়াই করে সে নিজের সাথে ক্লান্ত হয়, কিন্তু হার মানে না, মানতেও চায় না ? কোন স্বপ্ন দেখলে তা আর স্বপ্ন হয়ে থাকবে না ?

এই স্বপ্ন নামে প্রশ্নগুলি কবে সে মুছে দিতে পারবে তার আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকে।

হিন্দু ধর্মের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ

হরিপদ মাঝি

ভূমিকা ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। উনি জন্মগ্রহণ করেন ১২ ই জানুয়ারি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। ওনার পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত। যিনি একজন সফল আইনজীবী ছিলেন, ওনার মায়ের নাম ছিল ভুবনেশ্বরী দেবী, হিন্দু ধর্মের প্রতি জন্ম থেকেই উনি বিশেষভাবে আকর্ষিত ছিলেন। কথিত আছে যে ভগবান শিব স্বামীজীর জন্মের আগে ওনার মায়ের স্বপ্নে এসে বলেছিলেন আমি মানুষ রূপে পৃথিবীতে আসছি।

শৈশবকাল ঃ শৈশব কাল থেকে তিনি পশুপাখি খুবই ভালোবাসতেন। তিনি কুকুর, বিড়াল বিভিন্ন পাখিদের দেখাশোনা করতেন। অনেকে বলেন যে ছোটবেলা থেকে ওনার স্বপ্নে বিভিন্ন দেবদেবী আসতেন। যেমন ভগবান বিষ্ণু, বুদ্ধ, আদিদেব মহাদেব, অন্যান্যরা ছোটবেলা থেকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা চারটি বেদ মহাভারত, রামায়ণ পঠনপাঠন করতেন এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে। ওনার দাদু একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, ওনার নাম ছিল দুর্গা দত্ত। যার ফলে তিনি সন্ন্যাসের প্রতি আরো বেশি াকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখান, উনি বলেন যে যেমন জলবায়ুতে যে জন্ম নিয়েছেন সে তার ধর্মে তেমন শৃঙ্খলা তৈরি করেছেন। যেমন যারা উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে তারা পশু-পাখিকে দেবতা স্বরূপ পূজো করেছে এবং যারা মরু অঞ্চলে হয়েছে সেখানে চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ না থাকায় তারা পশু-পাখি শিকার করে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করেছে।

স্বামীজের জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ঃওনার জীবনে হিন্দু ধর্মের ঘর তৈরি করেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বেলুড় মঠে ধ্যান, ত্যাগ, জাগ, চার বেদ, গীতা ইত্যাদি জ্ঞান দেন এবং ওনার জীবনের হিন্দু ধর্মের প্রভাব অনেক আছে।

হিন্দু ধর্মের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ঃ তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যখন সেখানে উপস্থিত কিছু মানুষ হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে সবার নিচে রেখে হাসাহাসি করে তখন স্বামীজি হেসে বললেন যে আমার ধর্ম মহান তোমরাই বলে দিলে কারণ আমার ধর্ম সমস্ত ধর্মের ভার নিতে পারে তাহলে ভেবে দেখুন

কোনটা বড় নিজের ভার পরের উপর চাপিয়ে দেয়– সে, না যে সবার ভার নিতে জানে সে। তিনি আরো বলেন সর্ব ধর্মের জন্মদাতা আমারই হিন্দুধর্ম। আমি গর্বিত যে আমার ধর্মের মূল কথা হলো সর্বধর্মকে সম্মান করা। আমি সেই ধর্ম থেকে এসেছি যে ধর্ম কোনদিন কাউকে আক্রমণ করে না। সমস্ত ধর্মকে সম্মান করতে জানে। যে ধর্ম শান্তির বার্তা দেয়, আমি গর্বিত আমি একজন হিন্দু। আমি সেই ধর্মের অন্তর্গত যে ধর্ম মাটিকে মা বলে। ওনার বক্তব্যের পরে টানা দুই মিনিট করতালি থামেনি। পরের দিন সকালে পাশ্চাত্য দেশগুলির পত্রিকা একটাই নাম ঘোরাঘুরি করছিল– সেটা হল "স্বামী বিবেকানন্দ"। ওনার ওই বক্তৃতা পরে হিন্দু ধর্মের বিশ্বের রবারে মান লাভ করেছিল। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন লোক আমাদের হিন্দু ধর্ম গ্রহম করেছিল স্বেচ্ছায়। সর্বশেষে বলবো যে হিন্দু ধর্ম যেমন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে প্রভাব ফেলেছে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে উপযুক্ত মর্যাদা এনে দিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে হিন্দু ধর্মের পরিচিতির বিশেষ কান্ডারি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সামাজিক ত্রুটি

অনিমা পয়ড়্যা

এক অদ্ভুত এই সমাজ আমাদের, অকারণে স্বামীর হাতে মার খাবেন, আর শ্বশুর শাশুড়ি এসে বলবে তুমি কেমন মেয়ে জানো তো ওর মাথা গরম, রাগের সময় ওর সাথে তর্ক করো কেন ?

নিজের বাবা মাকে বলবেন ? বলবে মানিয়ে নিয়ে চল মারুক কাটুক ওটাই তোর ঘর শ্বশুর বাড়ি স্বামীর মারকে মার বলেনা শাসন বলে।

পাড়া পড়শিরা মিনিয়ে মিনিয়ে এসে বলবে মেয়েটির নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে নাহলে এত মার খায় নাকি ?

নিজের স্ত্রীকে যখন মেজাজ নিয়ে কথা বলবেন তখন আপনি পুরুষ, সিংহ পুরুষ আর যখন নরম নরম গলায় নিচু স্বরে ডাকবেন তখন আঁচল ধরা বেড়াল।

সংসারটা আপনার, বৌটিও আপনার, যে মেয়েটিকে বা মহিলাটিকে বৌ করে ঘরে নিয়ে এসেছেন, তার দিকে একবার তাকান।

আপনি বাজার করে নিয়ে আসলে আপনিও খান আপনার পরিবার খায় তার কষ্ট করে রান্না করা খাবার আপনাকে বাবাকে বাবা ও মাকে মা বলে ডাকে। আপনার ও আপনার পরিবারের বিপদে আপদে কাউকে পাশে পান আর নাই পান, কেউ পাশে থাকুক আর নাই থাকুক আজীবন এই মেয়ে, মহিলাটিকেই আজীবন পাশে পাবেন আপনার পাশে আপনার পরিবারের পাশে।

তাই সমাজের সুস্থ ও কর্তব্য পরায়ণ নাগরিক হিসেবে আপনার স্ত্রীকে সবসময় ভালো রাখার দায়িত্ব আপনার পুরোটা সমাজের নয়। আজ একটি ত্রুটি মুক্ত পরিবার মানে ত্রুটিমুক্ত সমাজ।

মানব জীবনের মূল্যবোধ

জবা ওঝা

মানুষ ঃ যার মান ও ক্ষুধা দুইই বর্তমান তাকে মানুষ বলে। মানুষের জীবনে চারটি দশা – (১) শৈশব, (২) কিশোর, (৩) দাম্পত্য, (৪) বার্ধক্য। জীবনের গুরুজনদের আশীর্বাদ, ছোটদের ভালোবাসা এবং গুরুজনদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ছোটদের ভালোবাসা ছাড়া জীবনে বড়ো হওয়া যায় না। তার মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সম্মান, বড়োদের প্রতি আচার-আচরণ ব্যবহার, সুভাষ থেকেই ভালো মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। তাই আমরা কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেব না। মিথ্যার আশ্রয় মিথ্যার শিকার হতে হবে। যার দ্বারা জীবনে কখনও উন্নতি করা যায় না।

মনকে সুস্থ রাখতে হলে সবসময় ধীরেসুস্থে কথা বলা এবং কম কথা বলা। কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে তার সমস্ত কথা শুনে যথার্থ উত্তর দেওয়া সেইটাই উত্তম মানুষের কাজ করা উচিত। না হলে বিপদে পড়তে হয়। মানুষকে সময়ের খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। কথায় আছে "Time and Tides wait for none" এর অর্থ সময় এবং জোয়ার কারোর জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। সময়ের মূল্যকে আমাদের পরিবেশের কাছ থেকে শিখতে হয় কারণ সূর্য ঠিক সকালে পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। তারা যদি সময় ঠিক করতে পারে, আমরা পারবো না কেন ?

মানুষের কর্তব্য ঃ মানুষের দেহ সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ও প্রিয়বস্তু হলেও মানুষ নিজেদের সম্পর্ক অল্পই জানে।

সবল করিবার উপায় ঃ

(১) শরীর কী করলে সুস্থ থাকবে তা কেন তা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জানা।

(২) যা খাওয়া হয় তা হজম হয় কিনা সর্বদা লক্ষ্য করা।

(৩) এছাড়া ব্যায়াম করা। শ্রমজনক কাজ করা।

(৪) সবপ্রকার কাজ শিখিবার চেষ্টা করা।

(৫) প্রতিটি মানুষের নিজস্ব একটি লক্ষ্য বা Ambition থাকা জরুরি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে ঃ শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সমভাবে একাত্মই প্রকৃত শিক্ষা এক কথায় এটাই মানুষের আত্মবিকাশ।

এর জন্য প্রয়োজন ঃ

(১) গীতা ও উপনিষদ থেকে মাধুর্যময় উদ্দীপক মন্ত্র সবদিন অর্থবোধসহ কণ্ঠস্থ করা।

(২) মহাপুরুষের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা করা ইত্যাদি।

অতএব নিজ জীবনটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেন তোমার কাজকর্ম তোমাকে দুঃখী না করে সুখের পথে চালনা করা। এইরূপ ভাবেই নিজেরা সুখী হওয়া ও সকলকে সুখী করা যায়।

মোদের দেশ

সুভাষিনী দাস

মোদের দেশ ভারতবর্ষ
যা তীর্থক্ষেত্রসম।
যেথায় আছে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ
নানান ধর্মের মানুষের মেলবন্ধন।
যা মেতে ওঠে উৎসবের তালে,
আবার তাই ওঠে মেতে

ঈদের কোলাহলে,
যেথায় পালিত হয় গুড ফ্রাইডে,
তাই মোদের দেশ ভারতবর্ষ।
যেখানে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ,
বিদ্যাসাগরের মতো বীরসন্তান,
যেথায় গাওয়া হয় সাম্যের গান।
তাই মোদের দেশ ভারতবর্ষ।
যার ভূমিতে লুটিয়ে গেছে
হাজার হাজার প্রাণ।
যার সেতুতে বয়ে গেছে
রক্ত স্রোতের বান।
যার বুকেতে উড়ছে মোদের
স্বাধীনের সম্মান।
তাই মোদের দেশ ভারতবর্ষ।

নারী

অসীমা দত্ত
৬ষ্ঠ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

মানুষ কেন বলে মোদের ...
নারীর নিজস্ব নাই কিছু।
আমি তো দেখি জগৎ চলে...
নারীর পিছু পিছু।।

বাপের ঘরে লক্ষ্মী আমি...
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরে জননী আমি...
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা।।

আমার থেকে আপন করতে...
আর কি কেউ পারে ?
বাপের ঘরকে ছেলে এসেও...
পরকে বাঁধি ঘরে।।

গোত্র থেকে গোত্রান্তর ...
যদিও আমি হই।
তবুও যেন জননী রূপে ...
সকল দুঃখ সই।।

ভারতমাতা সেও নারী ...
নারী জগদ্ধাত্রী।
নারী হল এ জগতের ...
সবার জন্মদাত্রী।।

মহাকাল আমার পদতলে...
শায়িত চিরকাল।
আমি ছাড়া এ জগৎ–সংসার,
সবই হবে অচল।।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই...
পুরুষকে বড় করে।
জেনে রেখো সেই পুরুষরাই
'নারী' ... গর্ভে ধারণ করে।।

অলংকারমালা

সুমনা দাস

ওই বট গাছটা সাক্ষী আছে,
অঝোরে বৃষ্টির ওজন কমতে পারে,
একবুক ভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আশ্বাসে,

সেই রাঙা চোখে আমার চোখ,
অপ্রতিহত কথা বলার ঝোঁক,
আমি ফিরে যাই সুদূর অতীতে,
আমি পারি না সেই সময় ভুলিতে।

তোমার চোখের কোঠার কমনীয়তা,
আমার আবদ্ধ প্রেমের গোপনীয়তা,
ঠিক মাঝরাতের হাওয়ার মত ছুঁয়ে যাওয়া,
ভোরের ফুলের সৌরভে যেনো আজও পাওয়া।

কোনো কোনো নদী যেনো আপনবেগে
পাগলপারা,
শান্ত, সুস্থির, ঈষৎ চাঞ্চল্য আরো আঁধারে সর্বহারা,
সেথায় প্রবল সহজ ভেসে চলা, মিশে যাওয়া নয়,
গতিপথ খুব নির্দিষ্ট, কর্তব্য পরায়ণে অকুতোভয়।

কোণঠাসা সময়ে হারিয়েছি ফিরে আসার শক্তি
আজীবন সেই নদী যে জানবে আমার সুপ্ত ভক্তি।

সুখ স্বপ্ন

সুচরিতা জানা

গভীর রাতে স্বপ্নাবেশে,
ডাকে আমায় রাত পাখি,
ঘুম ভাঙলে তাকিয়ে দেখি।
একাই আমি শুয়ে আছি।
এদিক ওদিক ঝিঁঝির আওয়াজ
আওয়াজ ভারী সুখ কর।
ক্লান্ত রাতের শান্ত বাতাস।
মনে হয় যেন ভয়কাতর।
আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি,
জেগেই আছে চাঁদ মামা।
উদাস মনে বলছে যেন,
'বাড়াও তোমার হাতখানা'।
মনের কোণে মনময়ূরী
ডাকছে মোরে একান্তে,
দিও তোমার ভালোবাসা
শীতের শেষে বসন্তে।।

কামনা

সুজাতা ভূঞ্যা

হও বলবান হও মহীয়ান
হও সবে মহাবীর।
হও গরিয়ান হও জ্ঞানবান
হও সবে রঘুবীর।।
আনো বরাভয় সবে করো জয়
হও সবে দিকপাল।
সত্যরে নিয়ে মিথ্যারে ভুলে
ধরো জগতের হাল।।
সবে ভালোবাসো, তমশায় নাশ
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।
জীবনের পথে সত্তার সাথে
নিজেরে গড়িয়া তোলো।।
সকলের সাথে সবাকার মতে
হও সবে আগুয়ান।
জগৎ মাঝারে পরহিত তরে
আপনারে করো দান।।
সবে ভালোবাসো বিদ্বেষ নাশো
তিমিরে করিয়া জয়।
সবার হৃদয়ে থাকো প্রভু হয়ে
অবিনাশী অক্ষয়।।

নীরব কান্না

মিলন নায়ক

সন্ত্রাসীদের হামলা বাজের
আত্ম সুখের গর্জনে।
হয় বেসামাল আকাশ পাতাল
কামান গোলার মর্দনে।।
মহামারীর ডঙ্কা ধবনির
এখনো তো যায়নি লেশ।
এরই মাঝে যুদ্ধে সেজে
বিশ্বটাকে করবি শেষ।।
তোমরা রাজা ওড়াও ধবজা
যুদ্ধ কর লাভের আশে।
অকারণে ভীষণ রণে
উলু খাগড়া প্রাণ বিনাশে।।
খাটিয়ে মাথা এদের কথা
চিন্তা করো হে অধিরাজ।
মরলে এরা থাকবে কারা
বলবে কে ভাই হে মহারাজ।।
বিশ্ব মাতা জগৎ পিতা
ডুকরে কাঁদে অন্ধকারে।
নীরবতায় জানিয়ে যে যায়
যুদ্ধ খেলায় মাতিস না রে।।

সোনার প্রদীপ

মধুমিতা দে

আমায় দিও তুমি—
তোমার পড়ার খাতা।
তোমার জন্য যে আমার—
তোমার গানের মাঠে,
রাঙা ধুলোর পথে যাওয়ায়
দেখা বার গোলাপ বাগান মাঠ
তুমি আমার গানের বন্ধু—
গ্রাম ছড়ানো সুরে,
ডাক দিয়েছে গাঁয়ের পথে
মনে তোলা রোদ্দুরে।
কাব্যের বীণা, বাজাও তুমি—
নামটি জানি মীনা,
আজও ভাবি আমি কী তোমায়—
ঠিক চিনেছি কি-না!
এই বসন্তে শুধু তোমার কথাই—
মনে পড়ে,
নীলাকাশ রংটি মেলে
তোমার মূর্তি গড়ে।
তুমি আছো, পরেও থাকবে—
দেখব দু-চোখ খুলে,
তাই তো তোমায় বরণ করি,
সহস্র সোনার প্রদীপ জ্বেলে।

রাজ্য

রঞ্জিত গিরি

একবিংশ শতাব্দীতে রাজ্য হলো দুর্ভিক্ষতে–
হাহাকারে বাড়ল সংখ্যা, এবার দেশে ভিক্ষুকদের।
চাষে পড়ল হাহাকার, মাঠে নাই আর ধান–
রাজ্য সরকার ভাবছে এবার, "বাঁচবে কী করে প্রাণ ?"
বৃষ্টি নাই বন্যা নাই, ভাবছে সবাই আজ—
পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্চে হয়েছে বন্ধ কাজ।
এই যে সময়, এই যে অসময় দিয়েছে বৃষ্টি ফাঁকি—
ছোটো বড়, সব চাষির ভারি কান্নার আঁখি।।
দূষণ আর অপব্যবহার করেছে পৃথিবী গ্রাস—
রাজ্যের মানুষ ভাবছে—'এবার হবে কী দেশের সর্বনাশ'।।

ছেলে বেলার কথা

রঞ্জিত গিরি

ছেলেবেলায় বসে আছি—
এক রাতের ছাদে।
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে খেলছি—
চাঁদের সাথে।
আবার ভাবি ছেলেবেলায়—
প্রাতে হয়নি শেষ।
না পারিলে আগামীকালে,
দুঃখ আছে বেশ।
অন্য সময় ডাকছি মাকে—
চেঁচিয়ে নিজের থেকে,
বলছি মাকে যাবো না কখনও—
স্কুল ফেলে রেখে।
আবার কখন দাঁড়িয়ে আছি—
ছাদের জানালা ধরে,
ভাবছি মনে ঘুমাতে হবে—
কখন স্কুল ছেড়ে।
টং টং করে বাজিল এবার চারিটা—
নিঝুম হল রাত্রী,
ছেলেবেলা, এখনও ঘুমিয়ে আছে
স্বপ্ন ছিল আমার যাত্রী।

বাংলা ভাষা

যুথীকা মাইতি

বাংলা ভাষা, বাংলা জাতি
বাংলা মোদের গর্ব।
বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখা
বাঙালির কর্তব্য।
বাংলা মোদের মাতৃভাষা।
কী সুন্দর তার গঠন কাঠামো,
এ বাংলা ভাষায় রয়েছে কত ঐতিহাসিক গুরুত্ব।
বাংলা গানের সুরের তালে
নেচে যে ওঠে, মোদের প্রাণ।
আজও বেঁচে আছে সেই রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষার গান।
মিষ্ট এই বাংলাভাষা
নেই তাতে কোনো তিক্ত
এই ভাষার ভাষাবাদি হয়ে আমি গর্বিত।

প্রিয় রবিঠাকুর

দেবী সাউ

বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব।
সবার বিশ্বকবি।।
মোদের হৃদয় আকাশ জুড়ে শুধু,
একটাই উজ্জ্বল রবি।।
আজও মোদের কানে ছন্দে বাজে,
সেই মিষ্টি রবীন্দ্রসুর।।
তোমার পদচ্ছবি পেয়ে শান্তিনিকেতনে,
ধন্য হয়েছে বোলপুর।।
ভুলব না কভু তোমার কলমে লেখা,
শত শত উপন্যাস গল্প।।
আজও রয়েছে তা আমাদের হৃদয়ে,
নয় তার স্থান অল্প।।
তোমার গল্প, কবিতা, গানে,
ডুবে থাকি মোরা আজও।।
আনন্দ ফুটে ওঠে মোদের মুখমন্ডলে,
ভুলব না মোরা এসব কখনও।।
বইয়ের পাতায় নাচের তালে,
তোমার গানে সুরে।।
তুমি রবে সদা, কানায় কানায়
বাঙালির অন্তরে।।

নীরব বেদনা

রিঙ্কি ঘড়াই

একটা মানুষ কেন কাঁদে নীরবে ?
কেন বুকের মাঝে চেপে রাখে গভীর বেদনা ?
কিসের লাঞ্ছনা ? কিসের তাড়না ? কিসের এত ঘৃণা ?
মুখে নেই রক, চুপ চাপ বসে ভাবে ?
দু'চোখের কোণে জল নিয়ে নেমে এল নীরব বেদনা।
কাতর বুকে থাকে কত দুঃখ, কতই না কষ্ট,
কেউ কোনো তা বুঝতে চায় না ?
যেন কোনো প্রিয় ছাড়া প্রেয়সী।
যেন কোনো মা হারা সন্তানের গভীর কান্না
ভালোবাসা মাখা ফেলে আসা দিনের পিছু ডাকা
পোড়া মনের কোনো ভিড় করে থাকা
একস্পষ্ট যাতনা।
থকে তুমি আপন ভেবে জড়িয়ে ধরলে
বিনিময়ে ও তোমার করল তোমার পর,
যার সুখ দুঃখের সাথী ছিলেন তুমি
কি করে আজ তুমি হলে পর ?
যার কাছে আশা করিছিলে একটু, ভালোবাসা
কি করে ও তোমার মরণ চায় সহসা ?
নিজে দুঃখে থেকে ওকে সুখী করালে
সুখ পাখি হয়েও আজ উড়ে গেল
তোমায় একা ফেলে।

তোমরা কি শুনবে আমরা ভাল মন্দ লাগা দুঃখ ব্যথা ?

অভিজিৎ আচার্য্য

তোমরা কি শুনবে কেউ
আমার কিছুকথা ?
আমার ভাল মন্দ লাগা
কিংবা দুঃখ ব্যথা ?
মাঝে মাঝে নিজেকে
লাগে বড় একা,
মনের মত বন্ধুর দেখা
পাবো আমি কোথা ?
চুপচাপ বসে থাকি
কিছুই লাগে না ভাল,
অবচেতন মন বলে ওঠে,
কিছু একটা কর।
পাই না কোন কাজ,
কখন যে পার হয়
সকাল-দুপুর-সাঁঝ।
একা একা কোন কিছুতেই
সময় আর না কাটে,
ইশ! একটা কাজ এখন যদি
থাকতো আমার হাতে;
ভাল কিছু যখন আর
করার না থাকে,
উদ্ভট কিছু চিন্তা ভাবনা
মাথায় চলে আসে।
সেইসব চিন্তা ভাবনার
আগা মাথা নাই,
চিন্তার সাগরে কখনো ডুবে
হাবুডুবু খাই,
মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে
বই নিয়ে বসি,
কি আর পড়বো ? এখন তো
লাগছে সবই বাসি।
কখনো কখনো মনে হয়
কিছু একটা লেখি
কখনো বা জানালা দিয়ে
দূরে তাকিয়ে দেখি।
চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে
সুদূরে হারিয়ে যায়,
মনের গভীর কল্পনা ছেড়ে
অনন্ত নীলিমায়।
কখনো আমি বন্ধুর কাছে
লিখতে বসি চিঠি।
উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকে
আমার নয়ন দিঠি।
চোখের সামনে ভাবে যে
কত রঙ্গীন স্বপ্ন,
মনের মাঝে জাগে কত
হাজারো জটিল প্রশ্ন।
মাঝে মধ্যে লিখে ফেলি
ছড়া কিংবা কবিতা,
কখনো পড়তে ভাল লাগে
রূপকথার গল্প কথিকা।

দুঃখ বিলাসী

উমা দাস

একমুঠো দুঃখ দেবে আমায় ?
মনে মেঘ জমে না বহুদিন,
অশ্রু আসে না চোখে।
নটরাজ রূপী হে রুদ্র বৈশাখ;
তোমার প্রলয় নৃত্যে সমস্ত দিন
জ্বলে পুড়ে হল খাক।
আমি আকাশ
ওহে দুঃখবিলাসী;
তোমার মেঘলা মনের ছোঁয়াচ
দেবে আমায় ?
অঝোর ধারায় কাঁদবো তবে আমি,
রুক্ষ মাটি ভিজিয়ে দেবো আমি,
ক্লান্ত প্রাণে শান্তি আনবো আমি,
শহর জুড়ে টাপুর-টুপুর বৃষ্টি হবে তুমি!

শব্দ

তনিষা রায়চৌধুরী

শব্দ খেলা করে
প্রাসাদ প্রতিম অট্টালিকা ঘিরে
একের পর এক শব্দ খেলা করে।
কান পেতে থাকে হলদে দেওয়াল,
শব্দ আঁকড়ে বাঁচে ইহকাল।
সবই আসে গল্প করার ছলে,
সহজ হিসেবে ক্রমশঃ জড়িল
শব্দের মায়াজালে।
শব্দ খেলা করে,
প্রাসাদ প্রতিম অট্টালিকা ঘিরে
একের পর এক শব্দ খেলা করে।
মাটির নীচে বহুতলের ভীত
পারস্পরিক সম্পর্কে বিষন্ন এক শীত
ধূর্তটি বেশ নিজেরটুকু
গুছিয়ে নিয়েছে দূরে,
অবোধ যে সে তলিয়ে গেল
বাগান বাড়ির মোড়ে
আজ শেষ মেষ শব্দ খেলা করে
প্রাসাদ প্রতিম অট্টালিকা জুড়ে
বিপ্লব ঘটে কলমে হাতিয়ারে।

নবান্ন

তনিমা দে

আনন্দে আনন্দে মেতে উঠে মন
উৎসব আনন্দে সারাটি জীবন
হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ সবাই এক
নবান্নের দিনে সবাই করে আনন্দ।

প্রতি বছর গোলা ভরে উঠে ধানে
কৃষকদের মন ভরে যায় গানে
কৃষি প্রধান দেশ এই বাংলাদেশ
নবান্নের দিন প্রকৃতির কতই বেশ।

নবান্নের দিনে হয় অনেকই মেলা
শিশুরা যায়না নিজ নিজ পাঠশালা।
বছর ফিরে বছর এল দিনটি করেবরণ
কখনো কেউ ভোলেনা তোমরা দিনটি রেখো স্মরণ।

হিজিবিজি

মৌসুমী শীট

যদিও আমি লিখতে জানি না
ভাবি কি লিখি
না পারলে লিখতে
ইচ্ছে করে হিজিবিজি
নই আমি কবি।
নই লেখিকা
নই গো কোনো কাব্যরচিতা।

আমি এক সামান্য নারী
হাতে নিলাম কলমের কালি
হেসো না পড়ে আমার কবিতা
আমি নই যে কোনো কাব্যের রচিতা।

আমি সামান্য এক নারী
বাংলার গৃহের ঘরনী জানি
ক্ষমা করিও আমার লেখার ভুল
করে নিয়ে তাকে ফুল।
ভুল ভুলেই হয় জীবন
কারণ আমরা সবাই এক প্রাণ এক মন।

মা ও স্ত্রী

সরস্বতী দাস

মা তিনি!
যিনি জন্ম দেন।
আর...
স্ত্রী সে!
যে তোমার জন্য জন্ম নেয়।
যিনি সব কিছুর সাথে পরিচয় করান।
স্ত্রী সে!
যে তোমার জন্য ছাড়তে পারে সবকিছু।
মা তিনি!
যিনি তোমাকে সম্পূর্ণ করেন।
স্ত্রী সে!
যে তোমার জন্য সম্পূর্ণ হয়।
মা হৃদয় স্ত্রী স্পন্দন
মা শ্বাস স্ত্রী জীবন
মা কর্ম আর স্ত্রী ধর্ম
তাই মা কে জননী বলা হয়।
আর...
স্ত্রীকে ধর্মপত্নী বলা হয়।
দু'জনকে ছাড়া তুমি প্রিয় অসম্পূর্ণ, অসহায়।
আর...
দু'জনের দ্বারাই তুমি প্রিয় পূর্ণ, সাহসী।

কুঁজো বুড়ী

চন্দনা পয়ড়্যা

কুঁজো বুড়ীকে দেখতে যদি
তোমরা সবে চাও,
রহিমদ্দির ছোট্ট বাড়ি
মেদিনীপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা
ভেন্না পাতার ছাউনি,
একটু খানি বৃষ্টি হলেও
গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হাওয়া দিলেই
ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে কুঁজো বুড়ী
থাকে বছর ভরে।
পেটটি ভরে পায় না খেতে,
বুকের ক-খান হাড়,
সাক্ষী দিচ্ছে অনাহারে ক'দিন
গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হতে
হাসির প্রদীপ-রাশি
থাপড়েতে নিবিয়ে দিচ্ছে
দারুন অভাব আসি।
পরাণ তার শতেক তালির
শতেক ছেঁড়া বাস,
সোমালি তার পা বরণের
করছে উপহাস।
ভোমর কালো চোখ দুটিতে
নাই কৌতুক-হাসি,
সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে
অশ্রু রাশি রাশি।

আতঙ্ক

উত্তম বারিক

"হিংসা নয়, নেই কোনো বিদ্বেষ
তবুও এই কৃতঘ্ন সমাজে
আতঙ্কের সমাবেশ।
কালের লহমান ধারায়
প্রকৃতির ধবংসাত্মক ইশারায়
যখন সকল কর্ম বন্ধু,
চারিদিকে ভেসে উঠেছে
শুধু আতঙ্কের গন্ধ।
নৈশ অন্তে সোনালী প্রভাতেও যেন
পড়েছে মেঘের ছায়া,
রুদ্ধ হয়েছে প্রকৃতির বুকে
সকল মোহমায়া।
সন্ত্রস্ততার আতঙ্কে
বহ্নঙ্কের মধুর কূজন, স্বাধীনতার দ্বারও যেন হয়েছে আজ বন্ধ,
চারিদিকে ভেসে উঠেছে শুধু আতঙ্কের গন্ধ।
সর্বগ্রাসীর করাল গ্রাসে
দিগ্বিজয় স্তব্ধ আবেশে
লুটিয়ে পড়েছে শত শত শব,
সন্ত্রস্ততায় চারিদিকে ভেসে উঠেছে
শুধু আতঙ্কের রব"।

ফেলে আসা দিনগুলো

গৌরাঙ্গ দাস

মিস করি ক্লাস রুম
মিস করি বন্ধু আর লাইব্রেরির রুম
সবই গেছে হারিয়ে
করোনা নিয়েছে সব কেড়ে,
এখন শুধু দিন কাটে
মোবাইলের গুগল মিটে,
আবার ফিরে পেতে চাই
ফেলে আসা দিনগুলো
যা ভুলবো নাকো কখনও
করোনা তুমি বিদায় নিও
ক্লাস রুমের দিনগুলোকে
ফিরিয়ে দিও।

আমার অনুভূতি

রচনা নায়েক

অল্প কিছু মনে পড়ে,
সেই দিনটার কথা,
ব্যাগ নিয়ে বাবার সাথে,
মাথায় নিয়ে ছাতা
কলেজেতে এলাম আমি,
নতুন শাড়ি পরে
ভয়, ভীতি, ভাল, মন্দ
থোড়াই কেয়ার করে,
সঙ্গী সাথী মাতৃস্নেহ
সব তো পেয়ে গেছি
খেলার ছলে পড়া আর,
পড়ার ছলে খেলা
এইভাবে কাটতে থাকে,
আমার কিশোর বেলা
দিনে দিনে মাসে মাসে,
বছর শেষ হয়,
আমার মনে কেমন যেন
বাড়তে থাকে ভয়,
শিশু পড়ানোর দায়িত্বটা
কাঁধে নিলাম যবে
বাবা বলেন দায়িত্বের ওজন
মেয়েরে বেশী হবে,
দুটো বছর কাটল আমার
দায়িত্ব নিয়ে কাঁধে,
ছেড়ে যাবার কথা ভেবে
প্রাণ ডুকরে কাঁদে।

জাতের বিচার

সত্যব্রত আচার্য

জাতের নামে বজ্জাতিতে
ভাঙলি দেশের ব্রহ্মশিরা।
জাত বেজাতের ছোঁয়া ছুঁই
মাথায় কেবল আছে পোরা।।
ভগবানের কি জাত ছিল
জানেনা ভাই টিকির ব্যাটা।
আল্লার জাত থাকলে জানা
বলনা দেখি দাড়ির জ্যাঠা।।
কিছুই যখন নেইকো জানা
তখন কেন জাতের বালাই।
বড় ছোট বিচার করে
করিস কেন দলাই মালাই।।
জগৎ মাঝে দুটি তো জাত
একটি পুরুষ ভিন্ন নারী।
নারী পুরুষ এই দুনিয়ার
সকল কিছুর সৃজনকারি।।
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ
তৈরি করা নামের মালা।
নামে বলো কি যায় আসে
সবাই তো ভাই একের পোলা।।
রক্তের রং সবারই লাল
তবে কেন জাতের বড়াই।
জগৎ পিতার ছেলে হয়
কেন তোরা করিস লড়াই।।

ঈশ্বর তুমি কোথায়

উত্তম বেরা
৬ষ্ঠ পাঠ-অধ্যায় (বাংলা অনার্স)

ঈশ্বর এ তোমার কেমন সৃষ্টি ?
আজও অন্যায়, অত্যাচার অভাব-অরাজকতার
দ্বারা মানুষ কতটা স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।
যাদের কোনো অভাব নেই তাদের পাশেই
স্বার্থপর মানুষদের ভিড়। আর রাজনীতির
রঙ্গমঞ্চে মানুষ মানুষের জীবন নিয়ে
ছিনিমিনি খেলছে। এখনো সমাজে অসংখ্য
মানুষ আছেন যারা দু-মুঠো খাবারের জন্য
রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে পড়ে থাকা
বাসি খাবারের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন।
সমাজের কোনো মানুষ এদের কথা ভাবেনা।
তারা শুধু ভাবেন নিজেদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার
কথা। অথচ রাস্তার ধারে, মন্দিরের সামনে
বড়ো অট্টালিকার সামনে, ফুটপাতে
তারা অন্নহীন, বাসস্থানহীন হয়ে বেঁচে আছে।
তাদের শুধু কতকাল শরীরটাই বেঁচে আছে, তাদের না আছে
মন, না আছে সুখ, শান্তি, কারো নেই
দুহাত, পা, কেউ বা অন্ধ কেউ বা দুর্বল অসহায়
ঈশ্বর তুমি কি এগুলো দেখতে পাও ? আচ্ছা
ঈশ্বর এমন সৃষ্টির কি দরকার ছিল ?
তোমার কি মনে কষ্ট হয় না, তুমি নাকি
আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তুমি নাকি
প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরাজ কর, তাহলে এমন
দশা কেন ? তুমি কি আজ অন্ধ, অক্ষম নাকি
অসহায় ? হে ঈশ্বর আজও তুমি কোথায় ?

যাও মেঘদূত

মহুয়া সাউ
৪র্থ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

মেঘলা আকাশ বইছে বাতাস বন্ধ পাখির গান।
আবছা আলোয় মনে হয় নাই পৃথিবীর প্রাণ।।
মেলবেনা চোখ পদ্ম কলি
গুঞ্জরণে বলছে অলি
সোনা রোদের মিষ্টি ছোঁয়ায় আসুক সুখের বান।
মেঘলা আকাশ বইছে বাতাস গাইবে পাখি গান।।

সূয্যি ঠাকুর লুকিয়েছে আজ গগন তলের পারে
বলছে ডেকে একটু সরিয়ে দেরে তারে।
দেখি ধরার মুখে হাসি
ঝরে পড়ুক রাশি রাশি
শিমূল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ায় রং ঝরিয়ে দেবে।
লক্ষ্মী শোনা দোহাই তোকে একটু সরে যারে।।

অন্ধকার ঢেকেছে আজ সকল ধরা তল
দেখনা চেয়ে শান্ত আছে নদীর শীতল জল।
বনানীদের বিরস বদন
সইতে নারি সবার কাঁদন
রাখাল বালক থামিয়েছে সুর বুড়ো কদম তলে
মাঠের পথে যায় না চাষা নাঙল কাঁধে ফেলে।।

দিবস হলে আঁধার ঘেরা মন বসেনা কাজে
যাও মেঘদূত তোর জ্বালায় মরছি আমি লাজে।
সবার কাছে আমায় কেন
ফেলনা করে দিচ্ছ হেন
ঘোর তমশায় আসিস রে ভাই সেটাই তোকে সাজে
দিবস হলে আঁধার ঘোর মন বসে না কাজে।।

শীতের সকালে

অনিন্দিতা দত্ত ৩য় পাঠ-পর্যায়, সমাজবিদ্যা

ঘন কুয়াশায়চারিদিকে ঢেকে
দূরেতে যায় না দেখা,
তারিয়ে তারিয়ে শীত উপভোগ
চেয়ে দিগন্তরেখা !
প্রাতঃভ্রমণেবেরিয়ে অনেকে
শারীরিক কসরত,
দেহটা যাতেইনা সে গড়বড়
চেষ্টা অনবরতা।
আসছে ভেসেইবাউল কণ্ঠে
সুরেলা প্রভাতী গান,
থুরথুর কেঁপেযেন লেপে ঢেকে
শুনি সে মধুর তান!
শামীম চাচাতোসাদিকে নিয়েই
পাড়ছে তো খেঁজুর রস,
জ্বাল দিয়েইনলেন সে গুড়
গন্ধে মন ফসফস।
সূর্যিমামারনেই কোনো দেখা
যেন গেছে মামা বাড়ি,
ফুল ও পাতায়ঘাসের ডগায়
শিশিরের বাড়াবাড়ি!
রামু সপু দিপুসৌমি মিলিদের
পিকনিক তোড়জোড়,
মাইক বাজিয়েকোমর দুলিয়ে
পাড়াময় হুল্লোড়!
ভেসে তো আসছেবল হরি বল
বদ্যিবুড়ো স্বর্গে,
পাড়ার মেয়েটিখেয়েছে যে বিষ
পুলিশ তাকে মর্গে!
রাঙা সোয়েটারেজড়িয়ে যে শীত
দারুন সব উপভোগ,
খোলা সে গায়েইথুথুরে কাঁপে
পথশিশুর দুর্ভোগ !

বিদায়

প্রতিমা সিংহ

৪র্থ পাঠ-পর্যায় (বাংলা অনার্স)

মনের ভাষা শব্দহীনা, ছিন্ন হৃদয় বীণ
কেমন করে বলবো বল আজ বিদায়ের দিন।
বিদায় মানে কষ্ট হাজার দুঃখ ভরা মন
খুব নীরবে খুঁজে নেওয়া স্মৃতির আলিঙ্গন।
বিদায় সে তো ছন্দ পতন নদীর বয়ে যাওয়ার
ফুল কলিদের ঝরে যাওয়া নিঠুর কোনো হাওয়ায়।
বিদায় মানে আনমনা মন তালা মনের ঘরে
হাজার স্মৃতি মন পাড়াতে শুধুই ঘরে ফেরে।
এই আঙিনায় হয় আগমন রঙিন কোনো দিনে
আজকে বিদায় তাইতো বিধি ব্যথার আলপিনে।
লক্ষ কোটি সহস্র সেলাম সকল গুরুজনে,
যাঁদের বোনা জ্ঞান বৃক্ষ– সবার হৃদয় মনে।।
তাঁদের সকল ভালোবাসা শাসন শিক্ষাদানে
মন খারাপের সকল সুরই বেজে ওঠে গানে।।
যদিও বা বিদায় হলো এই অঙ্গন থেকে
স্মৃতিগুলো মালা হয়ে থাক মাধুরী মেখে।
জীবন পথে হয়তো আবার জুড়বো একই ফ্রেমে
ততদিনে বিষাদগুলো মোড়া থাকুক প্রেমে।।

উত্তরণের পথে মানবতাবাদ

ডঃ রমেশ চন্দ্র মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
মোহনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

"Man would be erased, like a face drown in sand at the edge of the see."

_____Michel Foucault

বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী মানব প্রজাতির দৈহিক বিবর্তনের পাশাপাশি তার মনেরও বিবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয় সমাজব্যবস্থার বিবর্তন এবং মানবমনের বিবর্তন সমানতালে চলেছে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজতত্ত্বের জনক অগাস্ট কোঁত তাঁর ত্রিস্তরীয় বিধির তত্ত্বের মাধ্যমে এইধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানবসমাজ এবং মানবমনের এই ধরণের বিবর্তন মানবতাবাদ (Humanism)-কে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। একইরকমভাবে মানবতাবাদ তার চিরাচরিত ঐতিহ্যগত রুপ পরিবর্তন করে উত্তরমানবতাবাদে (Posthumanism) রূপান্তরিত হওয়ার অবিরাম প্রয়াস করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে মানবতাবাদ বলতে আমরা কি বুঝব সেটা খুব সংক্ষেপে বলা দরকার। আসলে 'মানবতাবাদ' শব্দটি কোনো একটা অর্থ বহন করে না, বহু অর্থ বহন করে। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন রকমভাবে এই মানবতাবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন দার্শনিক, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন যে, মানবতাবাদ মানুষের প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে। মানুষের অন্তরে যে মানব বসবাস করে সেই মানব ব্যাক্তিমানবকে অতিক্রম করে সর্বকালীন সার্বজনীন সামাজিক মানবের দিকে এগিয়ে যায়। মানবাদকেই তিনি মানুষের প্রধান ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। আর একজন দার্শনিক সমাজসেবক স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় জুড়ে বিরাজমান ছিল শুধুই মানুষ। মানবসেবাকেই তিনি ইশ্বরের সেবা বলে অভিহিত করেছেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে তিনি এক ঈশ্বরের সন্তান বলে চিহ্নিত করেছেন। দীন, দরিদ্র, অবহেলিত, অসহায়, অজ্ঞ মানুষের দুঃখমোচন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

মানবতাবাদী তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েরই দর্শন আজ এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক বলে মনে করছি। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিনল্যান্ডের একটা হাইস্কুলে ১৮ বছরের একটা বালক তার নিজের বনদুকের গুলিতে আটজন সহপাঠিকে হত্যা করে। সে তার ইউটিউব ভিডিওতে নিজেকে 'Natural selector' বলে দাবী করে। আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার গেঞ্জিতে লেখা ছিল "HUMANITY IS OVERRATED". সে তার বক্তব্যে বলছে যে 'মানবাধিকার', 'সাম্য' এইসমস্ত শব্দগুলোকে সে ঘৃণা করে। শুধু তাই নয় মানুষকে সে অন্য আর পাঁচটা প্রানীর সমতুল্য বলে মনে করে, অর্থাৎ মানুষের বিশেষ কোনো মুল্য তার কাছে নেই। বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক ফ্যেডরিক নিৎসে বলেছিলেন আকাশে যে অনন্ত শূন্যতা বিরাজ করছে ওই শূন্যতার মাঝে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর মৃত (God is dead)। আসলে ঈশ্বর চিন্তা মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে অর্থাৎ মুক্তচিন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অবাধ স্বাধীনতাভোগ এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে একটা ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক

রয়েছে। যদিও ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সাত্রে তাঁর "Existentialism is a Humanism" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন যে মানুষ তার প্রত্যেক কর্মের জন্য দায়ী, কারণ প্রত্যেক মানুষের সাধারণ সত্তার ওপর একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে যা মানুষকে তার নিজের অবস্থানে অনড় রাখে এবং নিজের অস্তিত্বের সমগ্র দায়িত্ব নিজের ওপরেই অর্পন করে।

নবজাগরণের হাত ধরে যে আধুনিকতাবাদের সূচনা ঘটেছিল সেই আধুনিকতাবাদ ব্যাক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রতাবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই আধুনিকতাবাদের উন্নত রূপ হল উত্তরআধুনিকতাবাদ। আর এই উত্তর-আধুনিকতাবাদের গর্ভে জন্ম নেয় উত্তরমানবতাবাদ। বিশিষ্ট আমেরিকান তাত্ত্বিক ইহাব হাসান ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "Prometheus as Performer: Toward a Postmodern Culture?" –এ উত্তরমানবিকতাবাদ সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "Humanism may be coming to an end as humanism transforms itself into something one must helplessly call posthumanism". পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন রকম ভাবে উত্তরমানবতাবাদ নিয়ে চর্চা করেছেন। ক্যাথারিন হেলস তাঁর "How We Become Posthuman" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে উত্তরমানবতা বুদ্ধিমান মেশিনের পাশাপাশি সহ-বিকশিত হয়। হেলস তাঁর লেখার মধ্যে উত্তর-মানবতাবাদ বলতে প্রজুক্তিগত উত্তরমানবতাবাদ, ডিজিটাল উপস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়কে বুঝিয়েছেন। হেলসের এই ধারনার সঙ্গে নারীবাদী তাত্ত্বিক ডোনা হারাওয়ের "Cyborg" ধারণাটির খুব মিল আছে। ডোনা হারাওয়ে বলছেন Cyborg শুধুমাত্র রূপান্তরিত মানবতা নয়, এটি অবশ্যই উত্তরমানবতাও বটে, যেটা ঐতিহ্যগত মানবতার মুল্যবোধকে কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করে আবার কোনো ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাস করে।

বিশিষ্ট ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক মিশেল ফুকো তাঁর "The Order of Things" শীর্ষক গ্রন্থে বলছেন যে, আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করছি যেখানে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে (End of man), যদিও ফুকো এই কথাটিকে একটি বিশেষ মেটাফর হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রজুক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তির ফলশ্রুতিতে যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সূচনা ঘটেছে তাকে ব্যবহার করে মানুষ তার শারীরিক এবং মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে সদা সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। এই প্রয়াস বর্তমান সময়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে প্রজুক্তি মানবসমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৮১৮ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছিল মেরী শেলীর উপন্যাস 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামে এক বিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে এক মৃতদেহকে প্রান দান করলেন। কিন্তু সেই মৃতদেহ প্রান পেয়ে এক কুৎসিত কদাকার দানবে পরিনত হল। যে দানব ঘটনার ঘনঘটায় তার সৃষ্টিকর্তা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সহ তার পরিবারের সমস্ত সদস্যকে হত্যা করে। এই উপন্যাসে মেরী শেলী দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের/ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সহায়তায় স্রষ্টার সৃষ্টি কিভাবে স্রষ্টার বিরোধী হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এবং প্রজুক্তিবিদ্যা মানবতাবাদের উত্তরণ ঘটিয়ে উত্তরমানবতাবাদে রূপান্তরিত করেছে। যেখানে মানুষের বিভিন্ন সৃষ্টি বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় মানবতাবাদকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

মানবতার আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে প্রজুক্তিগত উদ্ভাবনী। অর্থাৎ, প্রজুক্তিবিদ্যার সহায়তায় যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উদ্ভাবন ঘটেছে তা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের পরিবর্ত হিসাবে কাজ করছে। নিক বস্ট্রম তাঁর "A History of Transhuman Thought" শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন, প্রজুক্তিগত এই উদ্ভাবন এবং তৎসহ পরিবর্তনকে আমাদের সাদরে গ্রহন করতে হবে,

এগুলিকে নিষিদ্ধ করা যাবে না। তবে এগুলিকে আমাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে। উত্তরমানবতাবাদে যারা বিশ্বাসী তারা বলেন টেকনোফোবিয়া অথবা অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে যদি প্রজুক্তিগত সম্ভাব্য সম্ভাবনা গুলোকে অবদমিত করা হয় তাহলে তা আমাদের ব্যর্থতা বলেই পরিগণিত হবে। যদিও রূপান্তরিত এই মানবতাবাদে এটাও বিশ্বাস করা হয় যে উন্নত প্রজুক্তি জড়িত বিপর্যয় কিংবা যুদ্ধের কারণে যেসমস্ত জীবনহানি ঘটে তা অত্যন্ত দুর্ভাগজনক। রূপান্তরিত এই মানবতাবাদ অর্থাৎ উত্তরমানবতাবাদে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, প্রজুক্তিগত উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক যেসমস্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলিকে দূর করা সম্ভব এবং তা করতে হবে মানুষের নৈতিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। অর্থাৎ, আর্টিফিসিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারই হোক কিংবা অত্যাধুনিক গবেষণাই হোক সমস্ত কিছুই গ্রহনীয়, কিন্তু তা যেন মানুষের কল্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

দার্শনিকের দর্শন

নয়ন শীট

সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ভারতবর্ষ,

এখানে জড়ের মহিমা কথনে যেমন হাজারো গ্রন্থ লিখিত,
চেতন মহিমা কথনে তেমনি লক্ষাধিক গ্রন্থে রচিত।
জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব বলে শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈত,
এই মতের বিরোধীমত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত।
গৌতম প্রদত্ত ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার হলেন মুনি বাৎসায়ন,
পরাশরের পুত্র, ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি বাদরায়ন।
ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্যা ছন্দে রচনা করেন সাংখ্যসপ্ততি,
জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের দার্শনিক যিনি বাচকশ্রমন তিনি উমাস্বাতী।
বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মহর্ষি কণাদ,
কণাদকৃত বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্যকার হলেন প্রশস্তপাদ।
ভারতের প্রাচীনতম দর্শনের প্রবর্তক রূপে মহর্ষি কপিলের আবির্ভাব,
ভাট্ট মতে প্রমাণ ছয় প্রকার যার অন্তিম হল অনুপলব্ধি বা অভাব।
ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌড় জয়ন্ত ভট্ট প্রাচীন ন্যায়ের শেষ স্তম্ভ,
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম।
দাক্ষিণাত্যের সর্বদর্শন নিজ্ঞাত মহাপন্ডিত ছিলেন মাধবাচার্য,
নব্য ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্র প্রচার করে উদয়ন হলেন আচার্য।
গঙ্গেশের কালজয়ী গ্রন্থ যার নাম তত্বচিন্তামণি,
বাংলা ও বাঙালির গর্ব নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি।
জীব ও ব্রহ্ম, চেতন ও অচেতনের তত্বে পরিপূর্ণ ভারতীয় দর্শন,
তাই সকল আচার্য গণের চরণে রইল আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

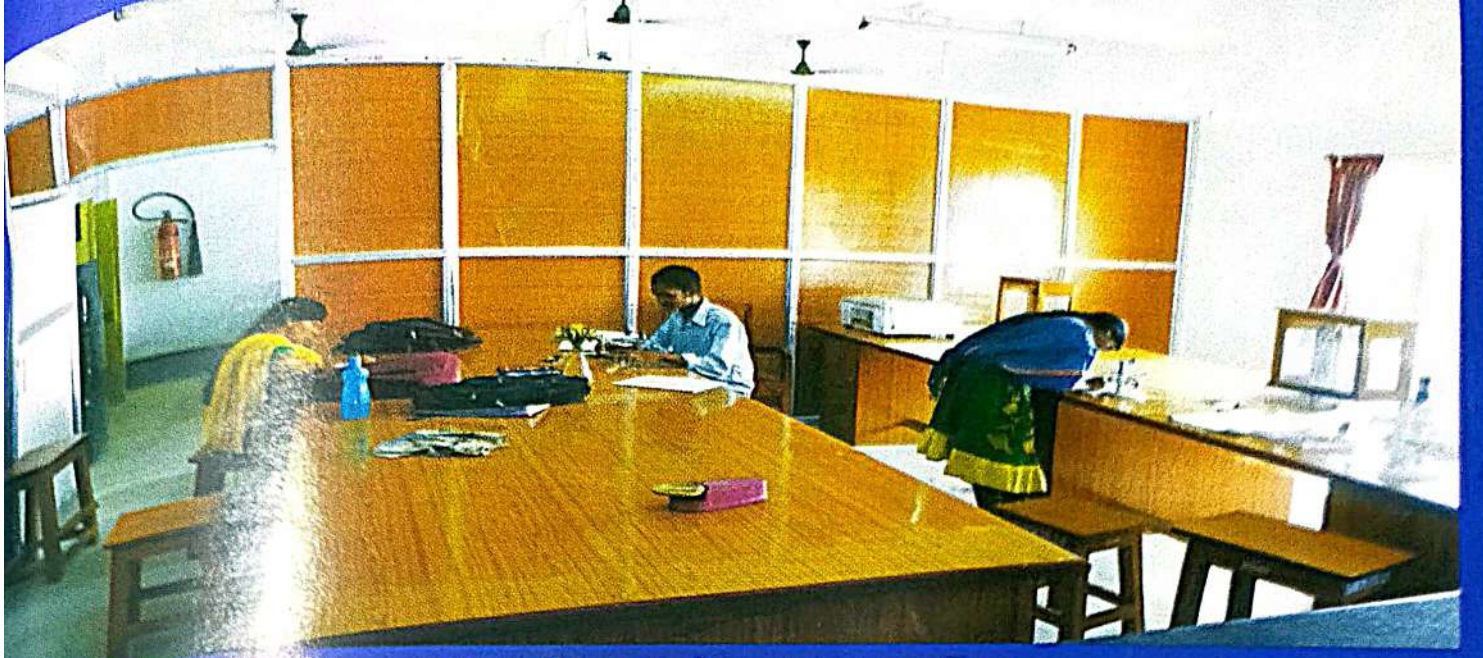

লাইব্রেরীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা

STUDENTS ACTIVITY CENTRE

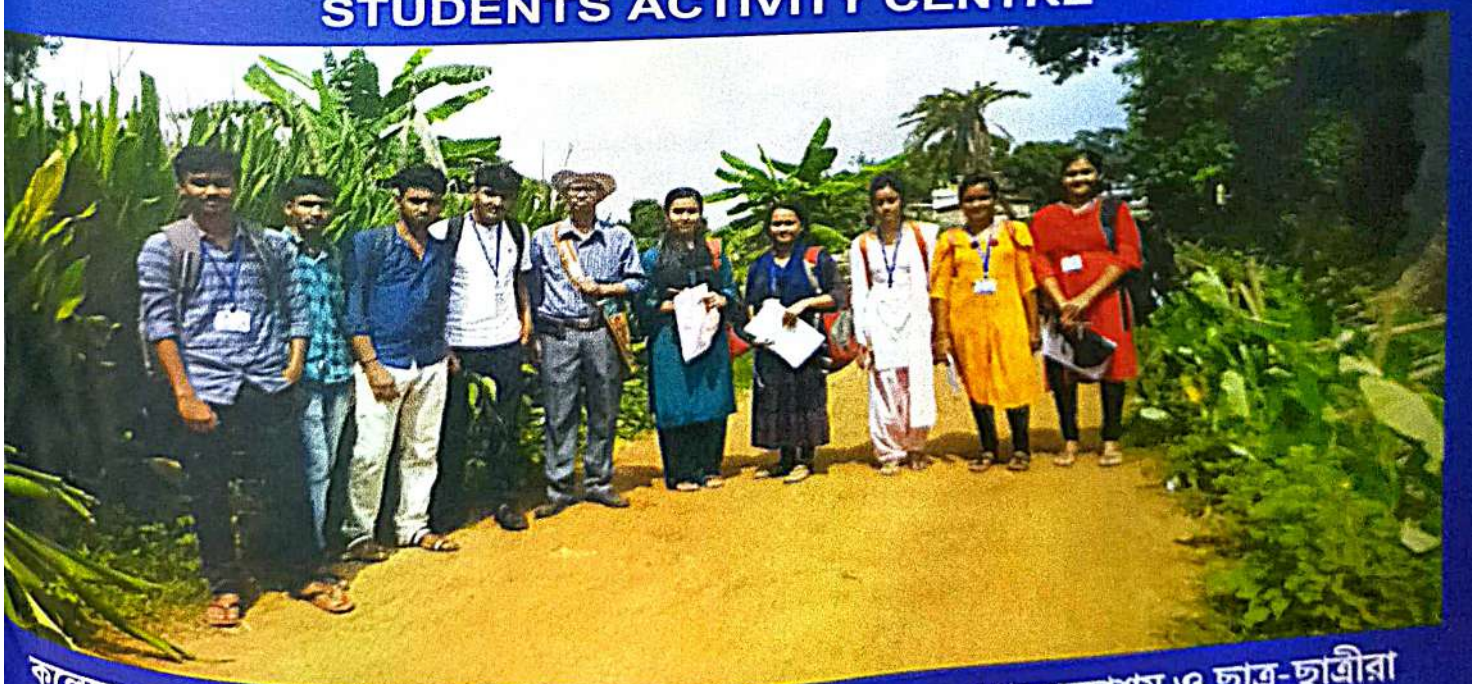

কলেজের বায়ো-সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে ক্ষেত্রসমীক্ষায় অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্র-ছাত্রীরা

কলেজের বায়ো-সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে ক্ষেত্রসমীক্ষায় অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্র-ছাত্রীরা

কলেজের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসবে অধ্যক্ষ মহাশয় ও আমরা

কলেজের NSS